প্রথম সংস্করণ মাঘ, ১৩৭৪

প্রকাশক ঃ
মোহাম্মদ ওহিদ উল্লাহ্
ষ্টুডেণ্ট ওয়েজ
বাংলা বাজার, ঢাকা

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ
কাইয়ুম চৌধুরী

প্রচ্ছদ মুদ্রণ ঃ
উদয়ন প্রেস

মুদ্রাকর ঃ
সালেহ্ আহমদ খান
শেলী প্রেস
৮/২, ওয়াইজঘাট রোড, ঢাকা—১

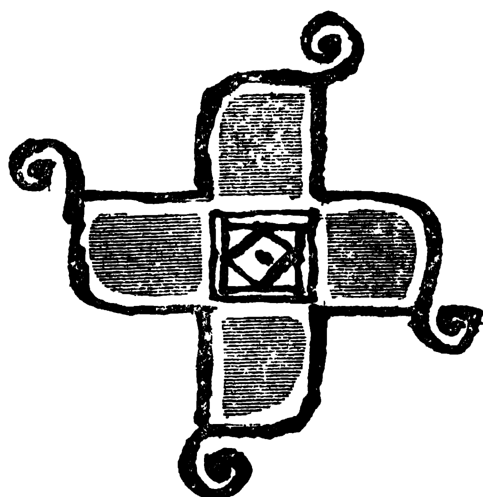
উৎসর্গ

আম্মার পুণ্যহস্তে

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ—

মুসলিম বাংলায় বিদেশী পর্যটক (যন্ত্রস্থ)

ময়মনসিংহের ধাঁধা (সম্পাদিত)—যন্ত্রস্থ



ভূমিকা

বাংলা দেশে পাল রাজাদের আমলে বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়। বৌদ্ধ গান ও দোহাগুলি সেকালের বাংলা ভাষার নিদর্শন। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পালদের পরে বাংলা দেশে সেন রাজারা রাজত্ব করেন। তাঁরা শুধু হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিলেন না, হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদের পুনরুত্থানে বিশ্বাসী ছিলেন। সেজন্যে বাংলা তাঁদের সংস্কৃতি ও চর্চার ভাষা ছিল না। দেবভাষা সংস্কৃতের মাধ্যমে তাঁরা রাজকার্য নির্বাহ করতেন। সংস্কৃত কবি জয়দেব লক্ষ্মণসেনের রাজসভার কবি ছিলেন।

সেন আমলে হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদের পুনর্জাগরণের ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হয়। মুহম্মদ ইখতিয়ারুদ্দীন বখতিয়ার খিলজি ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ জন অশ্বারোহী সৈন্য সমভিব্যাহারে লক্ষ্মণসেনকে পরাজিত ক'রে বাংলার সিংহাসন দখল করে নেন। তার পরের শতাব্দীকাল বাংলা দেশে মুসলমানদের রাজ্য বিস্তার ও স্থিতিশীলতার সংগ্রাম চলে।

এভাবে মুসলমান আমীর-ওমরাহ ও রাজা-বাদশারা রাজ্যের স্থিতিশীলতা বিধান করার পর শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। মুসলমানেরা সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী ছিলেন। তাছাড়া এদেশে আগমন করার পর মুসলমান সুলতানগণ এদেশের মাটিকে আপন ব'লে গ্রহণ ক'রে এদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। সেজন্যে এদেশের সাধারণ মানুষের কল্যাণের দিকেও তাঁদের সজাগ দৃষ্টি নিপতিত হয়। তার ফলে এদেশের মানুষের রচিত সাহিত্যেরও তাঁরা পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তখনকার দিনে বিজিত বাংলা দেশের অধিকাংশ অধিবাসীই ছিলেন হিন্দু এবং তাঁদের মুখের ভাষা ছিল বাংলা। বিজিত বাঙালী হিন্দুর মুখের ভাষায় রচিত সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা তাঁরা না করলেও পারতেন। তাঁদের মাতৃভাষা ও নব প্রচলিত রাজভাষা ফারসীর সাহায্যেই দেশের যাবতীয় কাজকর্ম নির্বাহ করতে পারতেন। কিন্তু তা না ক'রে মুসলিম সুলতানেরা প্রধানতঃ হিন্দু রচিত বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করলেন।

তাঁদের এ বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদ ও সংস্কৃত ভিত্তিক হিন্দু মানসিকতার বিরুদ্ধে এক রকম বিদ্রোহাচরণ ছিল। সেজন্যে সেকালের সাধারণ মানুষ মুসলিম সুলতানগণ প্রবর্তিত নব মানসিকতাকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছে। সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ (১৩৯২—১৪১০ খ্রীঃ), সুলতান জালালউদ্দীন মুহম্মদ শাহ (১৪১৮—৩১ খ্রীঃ), সুলতান শাম্‌স্‌উদ্দীন আহমদ শাহ (১৪৩২—৪২ খ্রীঃ), সুলতান রুকনউদ্দীন বারবক শাহ (১৪৫৯—৭৪ খ্রীঃ), সুলতান শাম্‌স্‌উদ্দীন ইউসুফ শাহ (১৪৭৪—৮১ খ্রীঃ) এবং সর্বোপরি সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহ (১৪৯৩—১৫১৯ খ্রীঃ) প্রভৃতি নাম বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হ'য়ে থাকবে।

বাংলা সাহিত্যের সার্থকনামা ইতিহাস লেখক স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেনই একথা প্রথম উল্লেখ করেছিলেন যে, মুসলমানেরা ইরান, তুরান প্রভৃতি যে স্থান থেকেই আসুন না কেন এদেশে এসে তাঁরা সম্পূর্ণ বাঙালী হয়ে পড়েন এবং হিন্দুদের ধর্ম আচার ব্যবহার প্রভৃতি জানার তাঁদের কৌতূহল দেখা যায়। সেজন্যে তাঁরা সংস্কৃত থেকে বাংলায় রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত ইত্যাদি হিন্দু ধর্মগ্রন্থ অনুবাদের প্রেরণা দান করেন। তাঁর মতে মুসলমান কর্তৃক বঙ্গ-বিজয়ই বঙ্গ ভাষার সৌভাগ্য ও শ্রীবৃদ্ধির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

প্রস্তুত গ্রন্থের স্বল্প পরিসরে আমার প্রীতিভাজন ছাত্র ও সহকর্মী ওয়াকিল আহমদ সুলতান আমলে বাংলা সাহিত্যের বিকাশ ও পরিণতির একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রচনা করেছেন। কোন্ সুলতান কিভাবে বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন এবং কার আমলে কি কি সাহিত্য রচিত হয়েছে এ সংক্ষিপ্ত আলোচনাটিতে একত্রে তার একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যাবে। সেদিক থেকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রস্তুত গ্রন্থটি যথেষ্ট প্রয়োজনীয় হবে ব'লেই আমি মনে করি। সেজন্যে গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি।

বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

—মুহম্মদ আবদুল হাই

প্রসঙ্গ কথা

পুস্তকখানি পড়ে যদি পাঠকের মনে হয় লেখকের 'সাধ' এবং 'সাধ্যে'র মধ্যে পুরো সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়নি, তবে এক অর্থে তা স্বীকার করে নিতে হয়। কেননা গ্রন্থের শিরোনামা যা দাবী করে, গ্রন্থের বিষয় তা সমর্থন করে না। এক্ষেত্রে কৈফিয়ত হিসেবে বলা চলে, আমি ঠিক বাংলা সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিনি, সাহিত্যের ইতিহাসের একটি বিশেষ দিক সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। এ অর্থে গ্রন্থখানি সমগ্রের পরিপূরকতা হারালেও খণ্ডাংশের পূর্ণাঙ্গতা হারায়নি। পাঠকবর্গকে এ ব্যাপারে অবহিত ও পরিতুষ্ট করতে পারলে আমার শ্রম সার্থক মনে করবো।

যে বিষয়ের ওপর আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি তার মোটা কথা হল, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে মুসলমান সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতা। সমসাময়িক কালের রাজনীতিক, আর্থনীতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ সম্বন্ধে বিচার করেছি। সঙ্গে সঙ্গে ভাষা ও সাহিত্যের নবায়ন ও মানোন্নয়নের বিষয়টিও আলোচনার চেষ্টা করেছি। বলা বাহুল্য, যুগপরিবেশের ওপর যত জোর দিয়েছি, যুগস্রষ্টির ওপর তত নয়। কেবল ভবিষ্যতে একে পূর্ণায়ত ও ঋদ্ধ করার আশা রাখি।

পুস্তক প্রণয়ন-পরিকল্পনা নিজস্ব হলেও রূপায়ণ-প্রচেষ্টায় স্বনির্ভর নই। তথ্য, তত্ত্ব, মতামত সংগ্রহে পূর্বসূরীদের কাছ থেকে অপরিমিত ঋণ গ্রহণ করেছি। যদি যথার্থভাবে তার ব্যবহার করে থাকি, তবে ঋণেও গৌরব। জ্ঞান-মহাজনের কৃতজ্ঞতাভাজনে আমি ধন্য।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ আমার শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু শ্রদ্ধেয় মুহম্মদ আবদুল হাই সাহেব 'ভূমিকা' অংশটি লিখে দিয়ে পুস্তকখানির যুগপৎ শোভাবর্ধন ও গৌরববর্ধন করেছেন। এজন্য আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করছি।

গ্রন্থ প্রকাশনায় ঢাকার ষ্টুডেণ্ট ওয়েজ দায়িত্ব নিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছে। এজন্য প্রকাশক সাহেবকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

চেষ্টা সত্ত্বে মুদ্রণ প্রমাদ দূর করা যায়নি। 'শুদ্ধিপত্রে' তা সংশোধন করা হয়েছে। অন্যান্য ত্রুটির জন্য পাঠকের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিই একমাত্র সান্ত্বনা।

নীলক্ষেত, ঢাকা ওয়াকিল আহমদ

২০।১২।'৬৭

সূচীপত্র

॥ পটভূমিকা ॥

বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের প্রাথমিক পর্যায়ে মুসলমান সুলতানদের আবির্ভাব ও পৃষ্ঠপোষকতা যে এক উল্লেখযোগ্য অবদান—এ সম্বন্ধে আজ আর প্রমাণের অভাব নেই। একে অতিরঞ্জন মনে করে কেউ যদি বলেন, ভাষা তার আপন শক্তিতে বিকাশলাভ করত এবং সাহিত্যবাহন হয়ে উঠত, তবে তাঁর আশাবাদের বিরুদ্ধে আমাদের বক্তব্য নেই। জীবন্ত ভাষা স্বশক্তিতে আত্মপ্রকাশের অধিকার রাখে সত্য, কিন্তু পূর্বনিদর্শনহীন ও পথপ্রদর্শনহীন ভাষার পক্ষে স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হতে পারে। বাংলা ভাষার সৌভাগ্য যে, উদ্ভব-মুহূর্তে এক উদার রাজশক্তির সাহচর্য লাভ করেছে যার ফলে তার পূর্ণ বিকাশ কেবল ত্বরান্বিত হয়নি, আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে বিপুল ঐশ্বর্যে সঞ্জীবিত ও নবশক্তির সম্ভাবনায় উজ্জীবিত হয়ে উঠতে পেরেছে। প্রগতি ও পূর্ণতার ক্ষেত্রে অন্তঃপ্রেরণার সহিত বহিঃপ্রেরণাও চিরকাম্য।

ভারতীয় আর্যভাষা তথা সংস্কৃত থেকে দেশীয় প্রাকৃত, প্রাকৃত থেকে অপভ্রংশ, এবং অপভ্রংশ থেকে আধুনিক পাক-ভারতীয় ভাষাসমূহের উদ্ভব-বিকাশ বলে পণ্ডিতগণ মত পোষণ করেন। অপভ্রংশের খোলস ছেড়ে বাংলা ভাষার জন্ম-যুগ নিরূপিত হয়েছে অষ্টম-নবম শতক।

এর তিন-চার শ' বছর পর বাংলা দেশে মুসলমানদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। 'চর্যাপদের' কথা স্মরণ করেই বলা যায়, এ সময়ের মধ্যে বাংলা-সাহিত্যের একটিও সংশয়াতীত নিদর্শন পাওয়া যায় না। চর্যাপদের দাবীদার এখন অনেক—বাংলা, উড়িয়া, অসমীয়া, হিন্দী, মৈথিলী প্রভৃতি। ভদন্ত রাহুল সাংকৃত্যায়ন, ডঃ জয়কান্ত মিশ্র ও ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখাত পণ্ডিতগণ স্ব স্ব মত প্রতিষ্ঠায় যে যুক্তি ও তথ্য হাজির করেছেন, হটকারিতা ছাড়া তা তো অস্বীকার করা যায় না। 'আলো আঁধারীর' ভাষা বলে দায়িত্ব এড়াতে পারি, কিন্তু রহস্যভেদ ও সন্দেহভঞ্জনের আলোক দেখাতে পারি না। আসলে চর্যাপদের মর্মমূলে উপকরণগত এমন এক সংকরধর্মিতা রয়েছে যা একক অধিকার প্রতিষ্ঠার স্ববিরোধী ও স্বতঃকুণ্ঠ।

চর্যাপদের 'বাঙ্‌লাত্ব' সম্বন্ধে এরূপ মতবিরোধ স্বীকার করে নিয়ে সংশয়াশ্লিষ্ট বিচারের জন্য যদি স্বতন্ত্র করে রাখি, তবে পরবর্তী প্রাপ্ত নিদর্শনের অন্তর্বর্তী সময়কাল বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে শুধু 'অন্ধকার' নয়, একটা চরম শূন্যতার যুগ বলা যেতে পারে।

এদিকে বাংলা দেশে সাহিত্যচর্চার অভাব ছিল, এমত নয়। মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্বের রাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজসভা কবিরত্নে অলংকৃত ছিল। তিনি নিজেই কবি, আবার তাঁর রাজসভায় সেকালের শ্রেষ্ঠ কবি-পণ্ডিতদের সমাবেশ হয়েছিল। জয়দেব, উমাপতি ধর, ধোয়ী, শরণ, গোবর্ধন প্রমুখের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এ প্রসঙ্গে এও উল্লেখ্য যে, এঁরা 'বাংলা দেশের' কবি হয়ে কেউ 'বাংলা ভাষার' কবি ছিলেন না। অথচ বাংলা ভাষার জন্ম এঁদের আবির্ভাবের অনেক আগেই হয়েছিল। এঁদের মাতৃভাষা নিশ্চয় সংস্কৃত ছিল না। জয়দেব গ্রাম (বীরভূমের কেন্দুবিল্ব) থেকে রাজসভায় এসেছিলেন। কেবল সে যুগে কেন, সংস্কৃত কোন যুগের কথ্য ভাষা ছিল না। পণ্ডিতগণের

মতে, তা কৃত্রিম লিখিত ভাষা। এখন প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, বাংলা ভাষার প্রতি তাঁদের এত বৈরাগ্য, এমন ঔদাসীন্য কেন ? সংস্কৃত 'দেবভাষা' (?), প্রাকৃতজ বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চা, ধর্মচর্চা কেবল রুচিবিরোধী নয়, নীতিবিরোধীও। এ সম্পর্কে পণ্ডিতেরা নরকে পতিত হওয়ার শাস্ত্রীয় তর্জন উচ্চারণ করেছেন। ব্রাহ্মণ প্রভাবপুষ্ট ধর্মভীরু বাঙ্গালীর সাধ্য কি আর বাংলা ভাষার শাস্ত্র বা সাহিত্য রচনা করে ?

এটা বিস্ময়ের কথা হলেও ঐতিহাসিক সত্য এবং গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যবাদ-পুষ্ট, সংস্কৃতভক্ত সেন বংশের পতন না হলে আরও কত কাল এমনই চলত, কে তার হিসেব রাখে। তাই একজন পরমত সহিষ্ণু পণ্ডিতের উক্তি এক চরম সত্যের প্রতি অকুণ্ঠ স্বীকৃতি—"বিদ্যার অর্ণবযানসদৃশ, দেবভাষার প্রতি অতিমাত্রায় শ্রদ্ধাবান টুলো পণ্ডিতগণের বাংলা ভাষার প্রতি বিজাতীয় ঘৃণার দরুন আমাদের দেশের ভাষা যে কোন কালে রাজদ্বারে প্রবেশ করিতে পারিত, এমন মনে হয় না।" (ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন ; বৃহৎ বঙ্গ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৫৬)। সুতরাং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সেবার জন্য একটা উদার, সহনশীল সাহচর্য প্রত্যাশিত ছিল যাতে করে উন্মুখ জনসাধারণ দুর্বোধ্য সংস্কৃতের দাসত্ব বন্ধন ছিন্ন করে প্রাণের ভাষায় হৃদয়ের দুটো কথা বলে। সংস্কৃতবান মুসলমান সুলতানদের নেকনজর শতাব্দীকালের যেন জীয়নকাঠি। রাক্ষসপুরীর বন্দিনী, ঘুমন্ত রাজকন্যার জাগরণ ও মুক্তির জন্য মানবপুত্রের সহযোগিতা কাম্য ছিল বই কি! যে সংস্কৃতাভিমানী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বাংলা ভাষায় ধর্মচর্চায় 'রৌরব নরক' ভোগের শাস্ত্রীয় বিধান জারি করেছিল, বাঙ্গালী-মাত্রের কাছে সে তো রাক্ষসেরই সামিল। রাজকুমার (ভাষান্তরে মুসলমান সুলতান) এলেন ঘোড়ায় চড়ে, বাংলার মসনদে বসলেন, ব্রাহ্মণ্যতেজ সংহত হল, শাপমুক্ত বাংলা ভাষার সেদিন বিজয়াভিযান সূচিত হল।

মুসলমান সুলতানদের মুখের জবান তুর্কি আর রাজভাষা ফারসী। এদেশ শাসন ও নিয়ন্ত্রণ করতে হলে দেশবাসীর অন্তরের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে—এরূপ রাজনৈতিক বুদ্ধিপ্রণোদিত রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার অনুমান যদি কেউ করেন, তবে ঐতিহাসিক তথ্যানুকূল্যে প্রতিবাদ না ওঠাই সংগত। একই দৃষ্টিভংগিতে বিচার্য, ইংরেজ রাজানুগ্রহিতা তথ্যসাকুল্যে আমাদের কাছে আজ সুস্পষ্ট; কিন্তু দূরান্বয়ে মুসলিম সহযোগিতার প্রামাণিকতা অনুমানাশ্রিত হলেও এদেশের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং স্বীয় বিদ্যানুরাগ মতসপক্ষে যথেষ্ট সহায়ক। ইংরেজ এদেশকে শাসন আর শোষণ করতে এসেছিল, মুসলমান এদেশে স্থায়ী বসবাসের জন্য এসেছিল। শাসক ও শাসিতের প্রভেদ যেখানে স্বীকৃত হয়নি, সেখানে এদেশীয় জীবনচর্যা, ভাষাচর্চা, শিল্প-সংস্কৃতির আস্বাদন প্রবলতর হওয়ার কথা। বাস্তবিক মুসলমান সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতা কেবল প্রয়োজনবোধে প্রয়োগসিদ্ধ ছিল না, আস্বাদন-কাম্য অন্তরবাসনাও সক্রিয় ছিল। কেবল বাংলা দেশে নয়, ইসলামের বিজয়াভিযান যখন সারা এশিয়া ও ইউরোপে দুর্বার এবং অপ্রতিহত তখন সে সব অঞ্চলের সংস্কৃতি-সভ্যতাকে রপ্ত করার জন্য কেবল তাদের ভাষা শিক্ষাই প্রয়োজন হয়নি, তর্জমা ও সমালোচনার সাহায্যে কৃষ্টির মর্মোদ্ধারেও উৎসাহের অভাব ছিল না। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় মুসলমান খলীফাগণের বিদ্বানুরাগ ও জ্ঞানপিপাসার কথা শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করে বিমুগ্ধ হয়েছেন। সেদিন তাঁরা দুরুচ্চার্য, দুর্বোধ্য সংস্কৃত, গ্রীক, হিব্রু প্রভৃতি প্রচলিত ভাষার জ্ঞানগরিমার পরিচয় পেয়ে ও আয়ত্ত করে ইসলামের আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে অতি অল্প সময়ের মধ্যে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাতীয়ত্বের মর্যাদালাভ করেছিলেন। সুতরাং আরব-তুরস্ক থেকে আগত মুসলমান সুলতানদের বিদ্যা ও জ্ঞানের মর্মোপলব্ধি রক্তবীজের স্বতোৎসার, কৃত্রিম দাক্ষিণ্যমাত্র নয়।

কেউ যদি প্রশ্ন করেন, ইংরেজ তার শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি নিয়ে না এলে বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতার মুক্তি কখন কিভাবে ঘটত—এর যা বাঞ্ছিত উত্তর—পাঠান সুলতানদের আগমন ত্বরান্বিত না হলে বাংলা ভাষার শৈশবজড়তা কখন কিরূপে বিদূরিত হত—এ প্রশ্নের জবাবেও তাই কাম্য। তবে পরিপ্রেক্ষিত বিচারণায় উত্তর-যুগের সাহিত্যবিকাশের গতি ও রূপপ্রকৃতির স্বতন্ত্রতা সম্বন্ধে অনেক বক্তব্য আছে। ইংরেজ আমলে এক প্রতিষ্ঠিত ভাষার ভিত্তিতে নবীন শক্তিসৌধ রচিত হয়েছে ; মুসলমান আমলে জন্মলগ্নের ভাষায় যৌবনের প্রাণপ্রাচুর্য সঞ্চারিত হয়েছে। একটি আদি হোতা অপরটি কেবল ফলপ্রণেতা। ইংরেজ যুগে বাংলা সাহিত্যের 'রেনেসাঁস' সৃষ্টির পেছনে আমাদের সাধনা কতখানি, আর বিদেশী প্রভাবপুষ্ট স্বতোৎসারণ কতখানি, তা আজকের হিসেবে আর দুর্নির্ণেয় নয়, কিন্তু মুসলমান আমলে বাংলা সাহিত্যের 'স্বর্ণযুগ' সৃষ্টিতে এদেশীয় জীবন সাধনার অপরিত্যজ্য শক্তি-সাফল্যের কথা আমরা ত' অস্বীকার করতে পারি না। পরমত অসহিষ্ণু সমালোচকের বিরুদ্ধতায় উষ্মা প্রয়োগে ও প্রকাশে সত্যালাপনে বিচারশক্তির শূন্যতাকে সূচিত করে। আজকে আত্মপ্রবঞ্চনার দিন গেছে। সত্যভাষণে পশ্চাদ্‌মুখীন জাতির মৃত্যুলাঞ্ছনা আমাদের কাম্য নয়, সত্যের মূল্য স্বশক্তিতে নিরূপিত হোক।

প্রথমেই স্বীকার করে নিতে হবে, এদেশে মুসলমানেরা বহিরাগত যে অর্থে আর্যরাও বহিরাগত। তবে আর্যব্রাহ্মণ্য ধর্মের সহিত দেশীয় অনার্যাচারের যে সংগ্রাম এবং আর্য হিন্দুধর্মের সহিত নবাগত ইসলাম ধর্মের যে সংগ্রাম—উভয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য। আর্যরা কোনদিন এদেশের অনার্যদের জাতে তুলতে পারেনি—বরং ব্রাত্য, নীচ, অস্পৃশ্য, রাক্ষস, দানব প্রভৃতি হীনমন্যতাজ্ঞানে চিরদিন ঘৃণা ও লাঞ্ছনা পুঞ্জীভূত করে তুলেছে। কিন্তু ইসলামের সাম্যবাদ ও

সৌভ্রাতৃত্ব এ বেড়াটাই প্রথমে ভেঙ্গে দিয়েছে। ‘যবন’, ‘ম্লেচ্ছ’, ‘অসুর’, ‘অকুলীন’ মুসলমানের মুখের জবানে কোথাও নেই। বাংলার চিরলাঞ্ছিত জনসাধারণকে শুধু জাতে নেওয়ার কথা নয়—জাতিধর্ম নির্বিশেষে সমান মূল্য ও মর্যাদা দিতে কুণ্ঠা ও কার্পণ্য ছিল না কোথাও। বিরোধক্ষান্ত যে কোন সুলতান সুবেদারের রাজসভা ও প্রজাপালন নীতি বিচার করলে ইসলামের আদর্শ সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের পরিচয় ফুটে উঠে। কৃত্তিবাস সুলতান জালাল উদ্দীনের (১৪১৮—৩১ খ্রীঃ) রাজসভায় প্রায় আট-নয় জন হিন্দু সদস্য দেখেছেন এবং তাঁদের নাম উল্লেখ করেছেন আত্মপরিচিতিতে ; হুসেন শাহের (১৪৯৩—১৫১৯ খ্রীঃ) রাজসভাতেও অনুরূপ সংখ্যক হিন্দু অমাত্য ছিলেন। রাজা গণেশের (১৪১৫—১৮ খ্রীঃ) স্পর্ধা তখনই গগনচুম্বী হয়েছিল যখন মুসলমানের বিশ্বস্ততা ও উদারতা পাশবনীতির কাছে পদদলিত হয়েছে। তাঁর রাজত্বের বছর কয়েকের মাথায় এদেশ মুসলমান শূন্য হতে চলেছিল এবং নররাক্ষসের হিংস্র খড়্গে প্রথমে পীরদরবেশদের রক্তপাত ঘটেছিল। তিনি জানতেন, প্রতিনিধিমূলক গোটা কতক পীরদরবেশকে নিশ্চিহ্ন করতে পারলে, সদ্যধর্মান্তরিত মুসলমানদের হজম করতে বিলম্ব হবে না। কিন্তু তাঁর এ পৈশাচিক পরিকল্পনা পূর্ণ হয়নি। অথচ যুদ্ধে পরাজিত গণেশ আত্মজের ইসলাম দীক্ষায় আত্মরক্ষার ক্ষমা পেয়েছিলেন মুসলমানের কাছ থেকেই।

আমরা স্বস্থানে ও সংগত প্রসঙ্গে ফিরে যাই। মুসলমান সুলতানদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা সাহিত্যের বিকাশ-বিবর্তনের ধারা আলোচনার আগে সাহিত্যচর্চার প্রেরণাগত কি সুযোগ-সুবিধে উপস্থিত হয়েছিল সে বিকাশকে সম্ভাবিত করতে, তার একটা মানস পটভূমি পর্যবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা আছে। এখানে শিল্পীর স্বাধীনতা ও মানসিক মুক্তি প্রথমে বিবেচ্য।

আগেই বলেছি, বাংলা ভাষার প্রতি সংস্কৃতাভিমানী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সামান্যতম শ্রদ্ধা ছিল না। শুধু কি ভাষা, 'বাংলা দেশ' ও 'বাঙালী জাতি'র প্রতিও তাদের ঘৃণা সঞ্চিত ছিল। কান্যকুব্জ থেকে আদিশূর যখন এদেশে এলেন রাজক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে, তখন এদেশের পবিত্রতা রক্ষার জন্য এবং বসবাসের যোগ্য করার জন্য স্বদেশ থেকে পাঁচজন ব্রাহ্মণকে আনতে হয়েছিল। আবার একমাত্র তীর্থছাড়া বাংলা দেশে এলে প্রায়শ্চিত্তের নির্দেশ ছিল 'বোধায়নধর্ম্মসূত্রে'। অষ্টম শতকে রচিত 'আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প' গ্রন্থে গৌড় ও পুণ্ড্রের অধিবাসীদের অসুর ভাষাভাষী বলা হয়েছে। 'ঐতরেয়' ব্রাহ্মণ গ্রন্থে এদেশবাসীর মনুষ্যত্ব হরণ করে নিয়ে বলা হয়েছে 'পাখী'। কোথাও কেবল 'পাপ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এদিকে প্রাচীন যুগে সাহিত্যচর্চা, শাস্ত্রচর্চা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। শাস্ত্রচর্চায় ধর্মানুরক্তি ছিল, সাহিত্য রচনায় বিলাস-সম্ভোগ। শিক্ষার অভাবহেতু হোক, কিংবা প্রচারের স্বল্পতাবশতঃ হোক কাব্যসাহিত্য পাঠ আজকের মত আপামর জনসাধারণের কাছে সতর্কজ্ঞানে সংস্কৃতির অঙ্গবাহী হয়ে ওঠেনি। কেবল রাজ-রাজড়া সৌখীনতাবশতঃ দরবারে বেতনভুক সভাকবি রেখে কাব্যরস আস্বাদন করতেন।

তৃতীয়তঃ অর্থনীতির দিক থেকে সাহিত্য সাধনা শিল্পীদের সাংসারিক জীবনে বিপর্যয় ঘনিয়ে তুলত। লক্ষ্মীর অধিবাস বাণিজ্যে, সাহিত্যে নয়। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য সাধারণ বাঙ্গালীর জীবনজীবিকায় নিশ্চিন্ত ভরসা খুব কমই দিতে পেরেছে। প্রাচীন যুগে লেখার উপকরণও দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য ছিল। সংরক্ষণ পদ্ধতি ছিল আরও হতাশাব্যঞ্জক। ফলে সাহিত্যসেবীদের পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হত। এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা নিতেন রাজা ও সভাসদ। সে যুগে রাজা যদি উৎসাহ দান, ভূমি দান, এমন কি অনুমতি দান না করতেন, তবে

সরস্বতীর সেবা করা সম্ভব ছিল না। এত সব বাধাবিপত্তি নিয়ে বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চায় আগ্রহবান শিল্পীর স্বল্পতা তাই বিস্ময়ের নয়, যুগনিয়মে বিড়ম্বনাও মনে করবো না।

মুসলমান ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে বাংলা ভাষার কবিগণ কোন হিন্দুরাজার কাছ থেকে সহযোগিতা বা দাক্ষিণ্য পাননি ; আমরা এজন্য দায়ী করেছি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের। বৌদ্ধ পালরাজাদের নৈতিক উদারতা ছিল ; তাঁদের সুশাসনে বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক জীবনে 'স্বর্ণযুগের' সঞ্চয় সমাহৃত হয়েছিল। বাংলা চর্যাপদের জন্ম তখনই। সেন বংশের প্রতিষ্ঠা হলে পর (দ্বাদশ শতকে) ব্রাহ্মণ্যবাদ অকারণ রুষ্ট হয়ে উঠল এবং বাঙ্গালী বৌদ্ধ নিধন-পর্ব কেবল সমাপ্ত হল না, তাদের কৃষ্টিকেও নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা চলল। বৌদ্ধরা সেদিন নেপালে পালিয়ে গিয়ে এরূপ ধ্বংসযজ্ঞ হতে চর্যাপদের অবলুপ্তি রোধ করেছিল। ব্রাহ্মণ্যরোষে কত বাংলা-বৌদ্ধ গ্রন্থের সেদিন মৃত্যু-সমাধি রচিত হয়েছিল, আজ তার কে হিসেব দিবে ? মুসলমান জাতি আর ইসলাম ধর্ম বৌদ্ধদের হজম করে নিয়েছিল— এমত সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিপ্রসূত, প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধদের অস্তিত্বে ইসলাম কোন দিনই আঘাত দেয়নি, বরং জীবন রক্ষায় মুসলমানরা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন, সমসাময়িক লেখক রামাই পণ্ডিতের 'শূন্যপুরাণ' (নিরঞ্জনের রুষ্মা অংশ) তার অভ্রান্ত দলিল। বৌদ্ধরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল উৎপীড়নে নয়, স্বতঃ প্রবর্তনায়।

এদিকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের স্থান হল অজ্ঞাত পল্লীর গোয়ালঘরে। রাজসভার চৌহদ্দি পেরিয়ে, রাজানুগ্রহের নির্ভরতা উপেক্ষা করে বাংলা সাহিত্য যে জনসাধারণের গৃহ প্রাঙ্গণে নেমে এসেছিল এটা তারই জ্বলন্ত প্রমাণ। চণ্ডীদাস রাজার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন

বলে এ পর্যন্ত কোন প্রমাণ আবিষ্কৃত হয়নি। চণ্ডীদাস-প্রিয়া রজকিনী-রামীর পদ, আরবী ফারসী শব্দের প্রয়োগ ও কিংবদন্তীর ওপর নির্ভর করে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় ও শ্রদ্ধেয় ডঃ শহীদুল্লাহ সাহেব চণ্ডীদাসকে গৌড়সুলতান সেকন্দর শাহের (১৩৫৭-৭৩ খ্রীঃ) 'প্রিয়পাত্র' ও 'সভাকবি' বলে উল্লেখ করেছেন (বাংলা সাহিত্যের কথা, মধ্যযুগ, পৃঃ ৫২ ও ৩৫৪)। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রতিপাদ্য বিষয়, রস ও রুচি লক্ষ্য করে মনে হয় না বাংলা দেশে ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠার যুগে একজন মুসলমান সুলতানের এতে সমর্থন ছিল।

এছাড়া পরবর্তীকালে সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় যে সব গ্রন্থ রচিত হওয়ার স্পষ্ট স্বীকারোক্তি পাওয়া গেছে, সেগুলির অধিকাংশই সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ, মৌলিক রচনা প্রথম দিকে একটিও নেই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রচলিত লোককাহিনী অবলম্বনে রচিত মৌলিক আখ্যানধর্মী কাব্য। চণ্ডীদাস 'সভাকবি' ছিলেন না, স্বভাব-কবি ছিলেন। রামী ও চণ্ডীদাস একত্রে চারণ কবির ভূমিকা পালন করে গেছেন। ইংরেজী 'ব্যালাডে'র মত রাজ্য হারার বেদনা নেই, শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে চিরন্তন মানব বেদনার গুঞ্জরণ আছে।

রাজ পৃষ্ঠপোষকতা ব্যতিরেকে যদি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের জন্ম হয়ে থাকে তবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিচারের স্বতন্ত্র মানদণ্ড হওয়া উচিত। বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার প্রথম দেড়শ'-দুশ' বছর সংগ্রাম-বিক্ষুব্ধ ছিল। রাজায় রাজায় বিরোধ লেগেছিল। দেশের রাজনৈতিক আকাশ যখন ঝঞ্ঝা-ক্ষুব্ধ বিপ্লব-পীড়িত তখন সাহিত্য সাধনার কথা একেবারে অসম্ভব ছিল। মধ্যযুগীয় সাংস্কৃতিক পটভূমিকায় এটা অতিকথন নয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এরই মাঝখানে জন্ম নিয়ে থাকলে তৎকালীন সমাজজীবনের অন্য একটি অবস্থাকে সূচিত করে। মুসলিম বাংলার ইতিহাস পাঠে জানা যায়, রাজ-ক্ষমতার উত্থান-

পতন বা রদবদল হলেও বাংলা দেশে রাজায়-প্রজায় সংগ্রাম কোন সময় তেমন প্রবল হয়ে ওঠেনি। বিশেষতঃ যে দেশে বসবাসের বাসনা রয়েছে সেদেশে প্রজা-নির্যাতনের প্রশ্ন ভ্রমাত্মক। উপরন্তু স্বনির্ভর ও গ্রামকেন্দ্রিক জীবন ব্যবস্থায় বহির্দ্বন্দ্ব আমূল বিপর্যয় সৃষ্টি করে না, কার্ল মার্ক্সের মত সমাজবিজ্ঞানীরা তা যুক্তিতথ্যে বিশ্লেষণ করেছেন। রাজবংশের উত্থান-পতন সেদিনের বৃহৎ বাংলার নিভৃত পল্লীতে যদি জনজীবনের শান্তি ভংগ করে না থাকে তবে সেখানে লোকগাথাকে আশ্রয় করে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আবির্ভাব অসম্ভব নয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি সেকন্দার শাহের সমসাময়িক হতে পারেন, কিন্তু অনুগ্রহপুষ্ট নাও হতে পারেন—আত্মবিবরণীতে যখন তার স্পষ্ট উল্লেখ নেই। কয়েকটি আরবী ফারসী শব্দের ব্যবহার প্রভাব-সঞ্জাত নয়, যুগসঞ্চয়।

এখন প্রশ্ন উঠবে, বাংলা সাহিত্যের যে সব নিদর্শন রাজ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল বলে প্রমাণিত ও স্বীকৃত হয়েছে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সহিত তুলনায় সেগুলির মূল্যমানের কি পার্থক্য আছে যাতে রাজানুগ্রহিতার গুরুত্ব বিবেচিত হতে পারে ?

আমাদের মনে হয়, এ প্রসঙ্গে প্রথম বক্তব্যটি হল—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন রচনায় ও প্রচারে আঞ্চলিকতার বন্ধন কেটে উঠতে পারেনি। শিল্পের প্রচার ও সমর্থন রসগ্রাহী পাঠকদের কেবল প্রেরণা যোগায় না, অনুবর্তন-বিবর্তনের স্বপরিমণ্ডলও (School) রচনা করে। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে রচনাগত আদর্শানুপ্রেরণার প্রয়োজন ছিল আত্যন্তিক। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পল্লীতে আশ্রয় না নিয়ে রাজদরবারে স্থান করে নিলে অথবা নিজস্ব কোন পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে পারলে উক্ত নিদর্শনের অনুকল্পে বহু গ্রন্থ আমাদের প্রাপ্য হত; যেমন এক বৈষ্ণব কবির আদর্শে বহু বৈষ্ণব কবির আবির্ভাব, এক মঙ্গল কাব্যের আদর্শে

বিবিধ মঙ্গল কাব্যের উৎসার। বাংলা সাহিত্যের জন্মমুহূর্তে সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতা পুস্তকাদির জনপ্রিয়তা বর্ধনে একটা গুরুত্ব-পূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। 'গৌড়েশ্বরে'র অকুণ্ঠ সমর্থন নিয়ে যেদিন সপ্তকাণ্ড রামায়ণের অনুবাদ শুরু হল সেদিন বাংলার আবালবৃদ্ধ-বনিতার জন্য যে কি সওগাত বহন করে এনেছিল, তা আজ হিসেবের অপেক্ষা রাখে না। গৌড়জন সেদিন তাতে আকণ্ঠ ডুব দিয়ে 'অমূল্য রতন' সংগ্রহ করেছিল। লক্ষ্মণ সেনের রাজসভায় রামায়ণের বঙ্গানুবাদ অকল্পনীয় ছিল। কৃত্তিবাস সংস্কৃত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। খুব আশ্চর্যের কথা, তিনি ব্রাহ্মণ গুরুর কাছ থেকে রামায়ণ রচনার অনুমতি পেয়েছিলেন। শুধু রামায়ণ কেন, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থেরও অনুবাদ ও প্রচার শুরু হয়েছিল। এ থেকে তৎকালীন বাঙ্গালীর মানসিকতার আমূল পরিবর্তন হয়েছিল— অনুমিত হয়। এ পরিবর্তনের যদি মূল্য স্বীকৃত হয় তবে তার সমস্ত প্রাপ্তি মুসলমান সুলতানদের। তখন রাজভাষা ছিল ফারসী। সুলতানেরা ফারসীতে গ্রন্থ রচনায় কবিদের অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করতে পারতেন। কিন্তু বাংলা দেশে রচিত সৃষ্টিমূলক একখানিও ফারসী গ্রন্থ পাওয়া যায়নি। এমন কি ধর্মের ভাষা আরবীতেও নয়। এর অর্থ হল, এদেশ থেকে শত যোজন দূরে অন্ধ স্বদেশ-প্রীতির নামে আরবীয় সংস্কৃতির আমদানী ক'রে ক্ষমতা বিস্তারের পথ বন্ধ ক'রে দেননি। এটা সুলতানদের দূরদর্শী রাজনৈতিক প্রজ্ঞারই পরিচায়ক। অতএব বাংলা ভাষার প্রতি তাঁদের দরদের একটা বাস্তব ভিত্তি ছিল। এর কারণ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মতামত ব্যক্ত করেছেন। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন, "..... বাদশাহের পরিবারে হিন্দুললনার আমদানী হওয়াতে এবং এদেশের বহু সম্ভ্রান্ত হিন্দু মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পরে বাদশাহী দরবারে বাংলা ভাষা

আদর লাভ করিয়াছিল।······পাঠান প্রাধান্যকালে বাদশাহগণ একেবারে বাঙ্গালী বনিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাদের দলিলপত্র অনেক সময়ে বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইত।······তাঁহারা হিন্দুর পুরাণ ও অপরাপর শাস্ত্রের মর্ম্ম জানিবার জন্য আগ্রহশীল ছিলেন। সংস্কৃত সম্পূর্ণ অনধিগম্য এবং বাঙ্গালা তাঁহাদের কথ্য ভাষা ও সুখপাঠ্য ছিল, এজন্য তাঁহারা হিন্দুর শাস্ত্রগ্রন্থ তর্জমা করিতে উপযুক্ত পণ্ডিতদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।" (পৃঃ ৬৫৬—৫৭, বৃহৎ বঙ্গ, ২য় খণ্ড)।

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেব লিখেছেন, "······স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে ইলিয়াসশাহী বাদশাহেরা বুঝিতে পারেন যে, আবশ্যক হইলে দিল্লীর রাজশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং দেশের সুশাসন রক্ষার জন্য দেশের অগণিত হিন্দুপ্রজাকে জানা ও তাহাদের সহানুভূতি লাভ করা একান্ত প্রয়োজন। ঐতিহাসিক যিয়াউদ্দীন বরণী তাঁহার "তারীখ-ই-ফীরোয শাহীতে" ইলিয়াস শাহের সহিত হিন্দু রাও, রানা ও জমিদারগণের মৈত্রীর কথা বলিয়াছেন। অবশ্য ইহাদেরই সাহায্যে তিনি ও তাঁহার পুত্র সিকন্দর দিল্লীর সম্রাট বাহিনীকে পরাস্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহারা দেশীয় সাহিত্যের উৎসাহদাতা ও পৃষ্ঠপোষক হন।" (পৃঃ ৪, বাংলা সাহিত্যের কথা, মধ্যযুগ)।

ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক সাহেবের অভিমত—"স্বাধীন মুসলিম বঙ্গের গোড়া হইতেই সুলতানদের বাঙ্গালী রমণী বিবাহের সূত্র ধরিয়া বাংলা ভাষা মুসলিম রাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে থাকে। তাহার উপর গৌড়ের হেরেমে বাঙ্গালী পরিচারিকার নিযুক্তিতেও এই ভাষা বাদশাহদের পরিবারে ধীরে ধীরে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। বাংলার হিন্দু-মুসলমান কর্মচারীর ব্যাপক নিযুক্তিতে······বাংলা ভাষা গৌড়ের শাহীদরবারে প্রতিষ্ঠা অর্জন করে। তদুপরি জালালুদ্দীনের

(যদু) ন্যায় খাঁটি বাঙ্গালী মুসলিম সুলতানদের স্বাভাবিক মাতৃভাষা-প্রীতি এই ভাষাকে শাহী দরবারে যে প্রতিষ্ঠা দান করিল, তাহা হুসেনী বংশের উদার দৃষ্টিভংগী, শিল্প ও সাহিত্যপ্রীতির সহিত মিশিয়া বাংলা সাহিত্যচর্চাকে দেশময় ছড়াইয়া দিল। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে গৌড়ীয় সুলতানদের এই দানকে পরোক্ষ দান বলা চলে না। বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের প্রত্যক্ষ দানে গৌড়ীয় সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতাও অন্যতম। এই সময়ে বাংলা সাহিত্য তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ না করিলে বনফুলের ন্যায় লোকচক্ষুর অন্তরালে ঝরিয়া পড়িত।" (মুসলিম বাংলা সাহিত্য, ২য় সং, পৃঃ ৪৭)।

ডঃ সুকুমার সেনের মতে, "পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রাজা কংস এবং তৎপুত্র যদু (জলালু-দ-দীন) কর্তৃক কবিপণ্ডিতের সম্বর্ধনা ও পৃষ্ঠপোষকতা না থাকিলে বাঙ্গালা সাহিত্যের যে কি অবস্থা হইত তাহা কল্পনা করা দুরূহ। গণেশ হিন্দুরাজা, তাঁহার পক্ষে হিন্দু কবি বা পণ্ডিতের পৃষ্ঠপোষকতা করা স্বাভাবিক। তৎপুত্র যদু····· এই বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে পিতৃপদাঙ্ক অনুসরণ করিলেন। তাঁহার পরবর্তী সকল রাজা বা সুলতান মুসলমান ছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, গণেশ গৌড় দরবারে যে রীতি নূতন করিয়া প্রবর্তিত করিলেন তাহা শতাব্দীরও অধিককাল ধরিয়া অক্ষুণ্ণ রহিয়া গেল। বাঙ্গালী পণ্ডিত ও কবির সম্মান করা গৌড়-দরবারের বিশিষ্ট রীতি হইয়া দাঁড়াইল। সুতরাং মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের উৎপত্তি ও বিকাশের উৎস গৌড় এবং তত্রত্য রাজদরবারে খুঁজিতে হইবে।

(বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৭১)।

উপরের মতগুলির সার-নিষ্কর্ষ হিসেবে মোটামুটিভাবে বলা যায়, ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন এদেশীয় ভাবাপন্ন পাঠান সুলতানদের স্বভাব-প্রবৃত্তির ওপর জোর দিতে চান; ডঃ শহীদুল্লাহ সাহেবের মতে

সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতার পেছনে রাজনৈতিক কারণটি প্রধান ও প্রবল ছিল। ডঃ এনামুল হক সাহেব প্রকারান্তরে রাজদরবারে বাঙ্গালী হিন্দু-প্রভাব বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চার পথ প্রশস্ত করেছিল বলে মনে করেন। ডঃ সুকুমার সেন হিন্দুরাজা গণেশের স্ব-জাতিয়ত্বের ওপর প্রাধান্য দিতে গিয়ে মুসলমান সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতাকে একটা গৌণানুকরণ প্রবণতা হিসেবে বলতে চাইলেও বাংলা সাহিত্যের বিকাশে গৌড়দরবারের ভূমিকার ওপর যথেষ্ট মর্যাদা ও গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর প্রথম মতটি অন্ধ হিন্দুপ্রীতির নিদর্শন; আমরা পরে দেখব রাজা গণেশ বাংলা সাহিত্যবিকাশে কোনরূপ সহযোগিতা দান করেননি। তাঁর মাত্র চার বছরের রাজত্বকাল (১৪১৫—১৮ খ্রীঃ) অশান্তিপূর্ণ ছিল। তাঁর স্বদেশপ্রীতির চেয়ে গদিপ্রীতি অধিক ছিল। আত্মরক্ষার কূর্মবৃত্তিগ্রহণ করে পুত্রের ধর্মান্তরকরণের সন্ধিশর্তে ইব্রাহিম শর্কির সহিত যুদ্ধের অনিবার্যতা উপেক্ষা করেন। তিনি স্বাধীনচেতা নরপতি নন; সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে দরবেশনিধনে পরিকল্পনা দিতে পারেন, দরবারে পণ্ডিতের সমাদরের তাঁর অবকাশ কোথায়! তাছাড়া, শাহ মুহম্মদ সগীরের পৃষ্ঠপোষক সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ রাজা গণেশের আগেই বাংলা সাহিত্যচর্চায় আগ্রহ ও আন্তরিকতা প্রদর্শন করেন। সুতরাং ডঃ সুকুমার সেনের মতানুযায়ী গণেশের স্বতঃপ্রেরণার কথাটি খাটে না। মুসলিম বিজয়ের সূত্র ধরে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জনপ্রিয়তা ও ব্যাপকতা লাভের একটি ধর্ম ও সমাজভিত্তিক কারণ অনুসন্ধান করেছেন ডঃ মমতাজুর রহমান তরফদার সাহেব। তিনি লিখেছেন,

"Since the conquest of Bengal by the Muslims, Sanskrit had been losing its ground because of the decline of Brahminism as a culture. It had even-

tually to yield a place to the vernacular tongue which had Sanskrit for its grand father and Magadhi Prakrit for its father. An imperceptible conflict was going on between Brahminical culture and the local ideology even in Pre-Muslim Bengal. The growth of Bengali language and the birth of Bengali literature symbolised the triumph of the native culture over the Brahminical one." (Husain Shahi Bengal : Asiatic Society of Pakistan, 1965, P. 238)

এ প্রসঙ্গে তাঁর অন্য একটি মন্তব্য,

"The socio-cultural vacuum which was being created by Brahminism for years together, was thus filled up by Bengali language and the fresh and vigorous local culture it encouraged and embodied." (Ibid. P. 283)

পৌরানিক সংস্কৃতির ধারক ব্রাহ্মণগণ বাংলা দেশ, বাংলা ভাষা ও বাঙালী জাতিকে ঘৃণা করলেও সেন রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় সংস্কৃত চচার ভিতর দিয়ে ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করেছিল। মুসলিম বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণগণ রাজসমর্থন হারায়। বস্তুতঃ বাংলা দেশে সেনদের পতন প্রকারান্তরে ব্রাহ্মণ্যবাদের পতন। মুসলিম বিজয়ের প্রথম দেড়শ'-দুশ' বছর রক্তক্ষয়ী আর অর্থক্ষয়ী সংগ্রাম বিক্ষুব্ধের পর্ব গেছে। পরে স্বাধীন সুলতানদের সুশাসনে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলে পর যখন সাহিত্য শিল্পচর্চার ডাক পড়ল তখন ক্ষমতাচ্যুত ও অর্থক্লিষ্ট ব্রাহ্মণদের চিন্তাধারার অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। এদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী নিম্নশ্রেণীর। তারা লৌকিক আচার-সংস্কারে আকৃষ্ট ও অভ্যস্ত ছিল। রাজানুগ্রহ হারানোর পর আর্থিক কারণে তারা জনসাধারণের সংসর্গে ও সাহচর্যে আসতে বাধ্য হয়। অনেক লোক দেবতার পূজায় পৌরহিত্য করতে থাকে। রাজনৈতিক স্বার্থে মুসলমানগণ

ব্রাহ্মণ্য শক্তি ও সংস্কৃতিকে প্রশ্রয় দিতে পারেননি। এসব কারণে বাংলা দেশে সংস্কৃত চর্চায় ভাটা পড়েছিল। দেশীয় লোকাচার প্রাধান্য লাভ করলেও দেশীয় ভাষায় কাব্য-সাহিত্য সাধনার তেমন দৃষ্টান্ত ছিল না। বৌদ্ধরা এ পথে অগ্রসর হলেও তাদের অস্তিত্ব এদেশে আগেই বিলুপ্ত হয়েছে। বাঙ্গালী মুসলমানগণ (অধিকাংশ ধর্মান্তরিত) ইসলাম ধর্মাদর্শের পরিচয় লাভ করলেও স্বীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে স্পষ্ট স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেনি। তখন তাদের প্রতিষ্ঠার আর প্রাধান্যের এক প্রস্তুতিপর্ব চলছিল। ফলে বাংলা দেশে সৃষ্টির ক্ষেত্রে একটা শূন্যতার যুগ রচিত হয়েছিল। ভাষান্তরে এটাকে অনেকে 'অন্ধকার যুগ' বলতে চান। ডঃ তরফদার সাহেব কর্তৃক লিখিত "Socio-cultural vacuum" কথাটি এই অর্থে সত্য এবং যথার্থ।

এর পরই সুলতানদের আগ্রহে গণদাবী ও স্বার্থানুকূল্যে বাংলা ভাষা যুগনিয়মে সর্বাগ্রে স্বীকৃত হল। পরীক্ষা নিরীক্ষা তথা ক্রান্তিকালে অনুবাদ অনুকরণের দ্বারস্থ হতে হয়। বাঙ্গালীর সাহিত্য সাধনা তাই সংস্কৃতের অনুবাদ দিয়েই শুরু হয়েছিল। এর অত্যল্পকাল পরে দেশাচার ও লৌকিক ধর্ম স্থান গ্রহণ করে। ইংরেজ যুগে যখন বাংলা গদ্যের সূচনা-পর্ব চলছিল তখন পাদ্রীদের চেষ্টায় ইংরেজী বাইবেলের এবং পণ্ডিত-মুন্সীদের চেষ্টায় সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদই প্রথমে হয়েছিল। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের গ্রন্থাবলীর অধিকাংশ অনুবাদ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পর্যন্ত এরই প্রভাব। মৌলিক গ্রন্থ রচনা শুরু হয়েছে ইংরেজ আগমনের শতাব্দীকাল পরে। বলা বাহুল্য, উভয় যুগেই এ কাজের ভার সংস্কৃত পণ্ডিত ব্রাহ্মণদের ওপর পড়েছিল।

শিল্প ও সংস্কৃতির বিকাশ জীবনধর্মের লক্ষণ হলে ডঃ তরফদার সাহেবের মতের সার-নিষ্কর্ষ করে বলা যায়, বাঙালীর সমাজ, ধর্ম, অর্থনীতি এমন কি রাজনীতির সমন্বিত পরিবর্তনলগ্নে সংস্কৃত ভাষা

সৃষ্টির ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার জন্য স্থান ছেড়ে দিয়েছিল। এ পরিবর্তনের কেন্দ্রীভূত শক্তি হল মুসলিম বিজয়।

দেশীয় লোকসংস্কৃতির প্রতি সুলতানদের দৃষ্টিপাতের আর একটি কারণ সম্পর্কে ডঃ তরফদার সাহেব মন্তব্য করেছেন :

"Bengal's isolation (due to independence) from North India and Central Asia led to her cultural isolation which seems to have accelerated the process of the growth of local culture.···Persian was, no doubt, retained as court language; but there was no North Indian or Iranian streams to feed it so that it's very life was gone.·· As the influence of Persian culture on the life of Bengal was limited, Bengali language found a congenial atmosphere for development." (Ibid, P. 11)

দিল্লীকেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় মুসলমানের পক্ষে সাংস্কৃতিক জগতে সত্যই এরূপ বিপত্তি দেখা দিয়েছিল। উপরন্তু এদেশীয় মুসলমানের জন্য স্বতন্ত্র কোন ঐতিহ্যও গড়ে ওঠেনি, একথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। ফারসী ভাষা ও সাহিত্যকে জনপ্রিয় করার জন্যই বুঝি সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ সিরাজের কবি হাফিজকে আমন্ত্রণ জ্ঞাপন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। সুতরাং উত্তর ভারত ও ইরান তুরস্ক থেকে সাংস্কৃতিক খোরাক সংগ্রহ করতে ব্যর্থকাম হয়ে সুলতানগণ বাঙ্গালীর ঐতিহ্যের প্রতি নজর দেন এবং সেখান থেকে শিল্পরস সংগ্রহের চেষ্টা করেন। পরাগল খান, ছুটিখান প্রমুখ রাজপ্রতিনিধিগণ এই আগ্রহ বোধ থেকে মহাভারত তথা হিন্দু পুরাণের বঙ্গানুবাদে কবিদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন। বিদেশী পর্যটকদের বর্ণনা থেকে জানা যায় আরব-পারস্য থেকে বণিকেরা বাংলা দেশে আসতেন। তবে লক্ষ্মী সেবায় বণিকবৃত্তির যত বেশী

আগ্রহ সরস্বতী সেবায় ঠিক তত কম। এদিক থেকে সুলতানগণ স্থানীয় সংস্কৃতির প্রতি সুনজর দিয়ে যুগপৎ এদেশীয় জনসাধারণের মন জয় করে রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলতে এবং বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রতিরোধ দৃঢ় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এটা জাতীয় স্বার্থের অনুকূল হয়েছিল। সুতরাং ডঃ তরফদারের এ মতটি সমর্থনীয়।

'সুলতানদের বাঙ্গালী ভাবাপন্নতা,' 'স্বাধীনসত্তায় রাজনৈতিক গুরুত্ববোধ,' 'জীবন ও সংস্কৃতির সংকরপ্রবণতা' 'দরবার-রীতির অনুসরণ প্রবৃত্তি' প্রভৃতি যাই হোক না কেন, আমাদের মনে হয়, এ সবের প্রভাবাতিরিক্ত সুলতানদের স্বভাবজ সংস্কৃতিবোধও সক্রিয় ছিল। কেবল দেশ জয় এবং দেশ শাসন একমাত্র লক্ষ্য নয়, সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীর মন জয় এবং স্থায়ী প্রভাবও মুদ্রিত করতে হবে। জীবন ও সংস্কৃতির সহিত একাকার হয়ে মিশে যেতে না পারলে 'জীবন যোগ' অসম্পূর্ণ থেকে যায়—যেমন এরূপ একটা মানসিক আগ্রহ প্রবল ছিল, অন্যদিকে তেমনি বিচিত্র জ্ঞানের ও অভিজ্ঞতায় আত্মিক মুক্তির ধারণা ইসলাম ধর্মের ও আদর্শের মৌলবাণী হিসেবে মুসলমানগণের যে আন্তঃবিশ্বাস, তার প্ররোচনায় ও প্রবর্তনায় পরিবেশাগত সুযোগ গ্রহণে তাঁরা পরাঙ্মুখ হননি। জ্ঞানান্বেষণে সুদুর চীনদেশে গমনের নির্দেশ যে ধর্মের অনুপ্রাণিত বাণী তার অনুসরণে মুসলমান কোন অবস্থার বিচারের অপেক্ষা রাখে না। সুতরাং গৌড় সুলতানদের সাহিত্যানুরাগ তথা সংস্কৃতি ভাবাপন্নতা তৎকালীন জীবনাবেদন ও যুগোপাত্ত বহিঃপ্রেরণামাত্র, রক্তবীজে অনুপ্রেরণার মূল নিহিত বলে সুযোগমাত্রই দেশ-কাল-পাত্র নির্বিশেষে চিত্তবিকাশের প্রশস্ত ক্ষেত্র রচনায় আত্মনিয়োগ করেছেন। কেবল মাত্র বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি সুলতানদের দরদ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেনি, পাশাপাশি

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের পোষকতায় উৎসাহ জ্ঞাপন করেছেন। পুরস্কার ও উপাধি দান কেবল কবি পণ্ডিতদের করেননি, অন্যান্য গুণী ও দক্ষ ব্যক্তিকেও যথার্থ পদমর্যাদায় ভূষিত করেছেন। সুলতান ফকরউদ্দিন শ্রীহর্ষসেনকে জমিদারী ও রাজা উপাধি দান করেন। সুলতান শামস্উদ্দিন ইলিয়াস শাহ দুর্যোধনকে 'বঙ্গভূষণ' ও চক্রপাণিকে 'রাজজয়ী' উপাধিতে সম্মানিত করেন। এঁরা যুদ্ধে সুলতানকে সাহায্য করেছিলেন। (ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৪৬)। ক্ষমতার সদ্ব্যবহার ও উদার দৃষ্টি-ভংগি ছিল সুলতানদের প্রধান লক্ষ্য। এসব উদ্দেশ্যে তদ্গতপ্রাণ সুলতানদের আন্তরিকতা ও কর্মপ্রশস্ততা সম্পর্কে পূর্ণোপলব্ধি অনুগ্রাহক কবি পণ্ডিতদের শিল্পকর্ম ও রাজপ্রশস্তিবচনের একটা ধারাবাহিক স্বীকারোক্তির বর্ণনায় লাভ করা যেতে পারে। মূল গ্রন্থে এ সম্বন্ধেই আলোকপাত করা হয়েছে।

বিভিন্ন রচনার সূত্রানুসারে সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ (১৮৩৯ খ্রীঃ—সিংহাসনারূঢ়) থেকে সুলতান গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ (১৫৩৮ খ্রীঃ—সিংহাসনচ্যুত) পর্যন্ত পৃষ্ঠপোষক হিসেবে উল্লেখ্য ও স্বীকৃত সকল সুলতানের কথাই বলা হয়েছে। যুগসীমা প্রায় দেড়শ' বছর। উক্ত সময়ান্তরে তিনটি রাজবংশের হাতে গৌড়ের সিংহাসন রদবদল হয়ঃ প্রথম ইলিয়াসশাহী বংশ, দ্বিতীয় জালালশাহী বংশ এবং তৃতীয় হুসেনশাহী বংশ।

দুটি পর্বে ইলিয়াসশাহী বংশ বাংলায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রথম পর্বের শেষ সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ এবং দ্বিতীয় পর্বের দু'জন সুলতান বারবক শাহ ও ইউসুফ শাহ বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। অনেকে মনে করেন, প্রথম পর্বের সুলতান সেকন্দর শাহ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচয়িতা চণ্ডীদাসকে রাজসভায় আমন্ত্রণ

ও আপ্যায়ন জানান। কিন্তু কবির রচনায় তার স্বীকৃতি পাওয়া যায়না বলে এবং অন্যত্র নির্ভরযোগ্য তথ্য আবিষ্কৃত হয়নি বলে আমরা তাঁর বিষয় আলোচনা করিনি। কিংবদন্তী অনুসারে এবং রামীর কবিতার তথ্য সূত্রে পদকর্তা চণ্ডীদাসের গৌড় রাজদরবারে আগমন ও পরিণতির কথা আলোচনা করেছি।

জালালশাহী বংশের জালালউদ্দিনশাহ ও মাহমুদশাহ বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতিতে ভূমিকা পালন করেছেন। হুসেনশাহী বংশের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। মোট চারজন সুলতান—হুসেন শাহ, নসরত শাহ, ফিরোজ শাহ ও মাহমুদ শাহ কোন না কোন বিষয়ে জড়িত থেকে বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধিতে উজ্জ্বল স্বাক্ষর চিহ্নিত করেছেন।

দিল্লীর শাসনপাশ মুক্ত ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হলে পর রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের অবসানে জনজীবনে শান্তি ও নিরাপত্তা নেমে আসে। সুলতানেরাও এদেশবাসীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি নজর দেওয়ার অবকাশ পেলেন। যুদ্ধজনিত এবং দিল্লীতে প্রেরিত রাজস্ব বাবদ অর্থের অপচয় থেকে রেহাই পেলে এবং জাতীয় স্বার্থে ব্যয়িত হওয়ার সুযোগ উপস্থিত হলে জীবনাসক্তিতে জনগণের মন আশ্বস্ততায় প্রথম সজাগ হয়ে উঠলো। আত্মপ্রকাশে যে জাগতিক যশোগৌরব সৃষ্টি প্রেরণার দ্বার উন্মোচন করে, বাঙ্গালী আর্থনীতিক প্রতিষ্ঠা লাভের সংগে সংগে সে বিষয়ে আগ্রহী ও অগ্রণী হয়ে সকল সংস্কারকে ঝেড়ে ফেলে পরীক্ষার মুখোমুখি দাঁড়াতে দ্বিধাবোধ করেনি। তারা দাঁড়িয়েছে এবং সফলকাম হয়েছে।

ইলিয়াসশাহী বংশের প্রথম সুলতান শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহের নেতৃত্বাধীনে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হলেও এদেশের স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রাম *কিন্তু শেষ হয়নি। দেশের শান্তি, শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতা* তিনটি কারণে বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

এক : দিল্লীর কেন্দ্রীয় শক্তির সহিত সংগ্রাম, দুই : পার্শ্ববর্তী রাজ্যের সহিত সংগ্রাম, তিন : অন্তর্বিপ্লবীর সহিত সংগ্রাম।

কেন্দ্রীয় শক্তির পুনঃপ্রসার, পার্শ্ববর্তী রাজ্যের সম্প্রসারণ নীতি এবং অন্তর্বিদ্রোহের সম্ভাব্যস্ফুরণে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে সৈন্য সংগ্রহ, শক্তি সঞ্চয় এবং জাতীয় ঐক্য অপরিহার্য ছিল। আবার ক্ষমতা বিস্তারের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। এই উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে ক্ষমতাশীল ও রাজ্যলিপ্সু সুলতানদের প্রধান লক্ষ্য হল, সর্বাগ্রে এদেশবাসীর অকুণ্ঠ রাজসমর্থন লাভ করা। সুলতান শামস্উদ্দিন ইলিয়াস শাহ বাঙ্গালীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি যত্নবান, শিল্প-সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহবান হয়ে উঠলেন। স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য স্বাধীন সুলতান জাতির স্বার্থ বৃদ্ধির পথ মুক্ত করেছিলেন।

ইলিয়াস শাহের রাজনৈতিক জীবন ব্যাখ্যা করলে এ মতের পূর্ণ সমর্থন পাওয়া যায়। তাঁর আগে পর্যন্ত বাংলা দেশ কয়েকটি ক্ষুদ্র কেন্দ্রে শাসিত হত। ইবনে বতুতার বিবরণ অনুযায়ী ১৩৪৬ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ববঙ্গের সোনারগাঁ কেন্দ্রে সুলতান ফকরউদ্দিন শাসন করতেন, পশ্চিমাংশের লখ্নৌতি কেন্দ্রে আলি শাহ। তিনি উভয় সুলতানের মধ্যে সংগ্রামের কথা উল্লেখ করেছেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, স্বাধীন পূর্ব বাংলা লখ্নৌতি, সোনারগাঁ ও সপ্তগ্রাম তিনটি রাজতন্ত্রে বিভক্ত ছিল। পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাবের চেয়ে বিবাদ বিসংবাদ অধিক ছিল।

ইলিয়াস শাহের একচ্ছত্র শাসনাধীনে এলে সমগ্র বাংলা ভাষা-ভাষী জনসাধারণ রাজনৈতিক, আর্থনীতিক এবং সাংস্কৃতিক ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হল। স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের অব্যবহিতকাল পরে সুলতানকে দিল্লীর শাসক ফিরোজশাহ তুঘলকের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়। নেপালে প্রাপ্ত প্রস্তরলিপিতে পাওয়া গেছে, ইলিয়াস শাহ বহুসংখ্যক 'বাঙ্গালী সৈন্য' নিয়ে নেপাল আক্রমণ করেন এবং তা ধ্বংস করেন। বরণী ও আরিফের মত প্রাচীন ঐতিহাসিকেরাও বলেছেন

যে, ইলিয়াস শাহের 'বাঙ্গালী সৈন্য' ছিল।

সেকালে ক্ষমতা লাভের আকাঙ্ক্ষা এত প্রবল ছিল যে, বহিঃশত্রু দূরের কথা, আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ-বিপ্লব কখন কোথা থেকে রক্তপাত ঘটায় তার নিশ্চয়তা ছিল না। ইলিয়াস শাহের সিংহাসন লাভের অল্পপূর্বে ইবনে বতুতার বিবরণ মতে সুলতান ফকরউদ্দিনের বিরুদ্ধে সাইদা নামে একজন দরবেশ ক্ষমতা বিস্তারের চেষ্টায় ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলে সুলতান তাঁকে এবং অন্যান্য পীরদের হত্যা করেন। জমিদার ও সামন্ত রাজারা কথায় কথায় সংগ্রামমুখী ও লুণ্ঠনব্রতী হয়ে উঠত। রাজকর্মচারী এমন কি খোজা ক্রীতদাসেরাও হত্যাকার্যে লিপ্ত হয়েছে ও সিংহাসন লোভী হয়ে উঠেছে, বাংলার ইতিহাসে তারও নজির বিদ্যমান।

এ সমস্ত প্রতিকূল অবস্থা দূর করে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে এবং স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখতে বাঙ্গালীর ঐক্যবদ্ধ সমর্থন লাভের জন্য সুলতান ইলিয়াস শাহকে কি পরিমাণ এদেশবাসীর মন জয় করতে হয়েছিল তা সহজে অনুমেয়। তিনি যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করলেন, পরবর্তী সুলতানগণ কমবেশী সে পথই অনুসরণ করেছেন। এ পথ থেকে দূরে সরে গেছেন যাঁরা, তাঁরা অশান্তি পেয়েছেন, দেশের কল্যাণ ব্যাহত হয়েছে। ঐকান্তিক আগ্রহবোধে মুসলমান আমলের বিভিন্ন পর্বে বিভিন্ন বিষয়ে জাতির যে উন্নতি সাধিত হয়েছে, আলোচ্য পর্বে তার গতি ও পরিমাণ অগ্রগণ্য।

এদেশবাসীর স্বার্থরক্ষায় সুলতানগণ যে অগ্রণী হয়েছিলেন তার বড় প্রমাণ বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের বিকাশ। জাতির নিকটতম স্বার্থ তার মুখের ভাষা। ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রভাবিত এদেশে ভাষা চর্চা যে কিরূপ প্রতিকূল অবস্থার মুখোমুখি ছিল, আমরা পূর্বে সে সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় জনগণের অচলায়তন ভ্রান্ত ধারণা প্রথমে ভেঙে গেছে। তাঁদের প্রচেষ্টায়

বাঙালীর সেদিন কেবল মানসিক মুক্তিই নয়, ব্রাহ্মণ্যবাদের চাপে যে লৌকিক সংস্কৃতি এতদিন অবহেলিত ও অবদমিত হয়েছিল, তার উদ্বোধনে দেশবাসীর আত্মাও স্পন্দিত হয়ে উঠেছিল। লৌকিক আচারের সঙ্গে বাঙালীর রক্তের যোগ, আত্মার সম্বন্ধ। সেন আমলে সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণের আধিপত্যে এবং দৌরাত্ম্যের ফলে বৈদিক ও পৌরাণিক ধর্মকর্ম প্রাধান্য লাভ করেছিল। রক্ষণশীল ও অন্ধবিশ্বাসী বাঙালী ব্রাহ্মণের হাত ধরে শুষ্ক আচারের সহিত দীর্ঘদিন ধরে জড়িত হয়েছিল, জটিল ক্রিয়াকাণ্ডে কোনদিন প্রাণের সাড়া পায়নি।

শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল বলে ধর্মশাস্ত্র ও শিল্প-সংস্কৃতির মর্ম ও রস আস্বাদনের কোনই সুযোগ পায়নি। ফলে সৃষ্টির ক্ষেত্রে সংস্কৃত জ্ঞানহীন বৃহত্তর বাঙালীর ভূমিকা একেবারে নীরব ও নিষ্ক্রিয় ছিল। সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা অনুবাদের ভেতর দিয়ে ধর্মীয় গ্রন্থগুলি অনূদিত হতে থাকলে তার সহিত পরিচয় লাভ করে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সবাই ধর্ম ও সাহিত্যের রসাস্বাদনের সুযোগ পেতে লাগল। সংগে সংগে ধর্মীয় আচারপ্রবণতায় ব্রাহ্মণ্যবাদের নিয়মতান্ত্রিকতাও দূরীভূত হতে লাগল। সাধারণ বাঙালীর কুটীরপ্রাঙ্গণে যে দেবতা আসন পেতেছিলেন কিন্তু সম্মানবঞ্চিত ছিলেন, এবার তাঁরই প্রভাব বড় হয়ে উঠল। হিন্দু বাঙালী উত্তরাধিকার সূত্রে বহু লৌকিক দেবদেবীর সহিত একান্তভাবে পরিচিত। এদের কথা লিখিত হয়নি, এদের পূজা প্রচারিত হয়নি। কেবল লোক সংস্কারে, লোক শ্রুতিতে, কিংবদন্তীতে, ব্রতকথায় ও গাথাকাব্যের মধ্য দিয়ে অনুশীলিত হত। মাতৃভাষায় মর্মকথা বলার স্বাধীনতা ও সম্মান যখন উপস্থিত হল তখন অন্তর্লোকে যে অভিজ্ঞতা, আচার-আচরণ একেবারে হৃদয়কে ছুঁয়ে আছে কবিগণ তারই মূর্তি রচনা, কাহিনী বর্ণনা করলেন। এরূপ মনোভাব থেকেই আমরা লৌকিক দেবদেবীর

স্তুতিবন্দনায় 'মঙ্গল' নামধেয় আখ্যান কাব্যগুলি পেয়েছি। লোকসংস্কৃতির বিকাশ না ঘটলে কয়েকখানি অনুবাদ গ্রন্থেই বাংলা সাহিত্যের মধ্য-যুগ নিঃশেষিত হয়ে যেত, যার মধ্যে না ছিল এদেশের আভ্যন্তরীণ পরিচয়, না ছিল এদেশবাসীর অন্তর্লীন মর্ম্মধ্বনি। বাঙালীর সাংস্কৃতিক জগতে লোককৃষ্টির প্রাধান্য ও বিস্তার সুলতান আমলের এক অমূল্য অবদান। বৈষ্ণব ধর্ম ও বৈষ্ণব সাহিত্য মানসিক মুক্তি ও স্বাধীন চর্চার সবচেয়ে সমৃদ্ধ ফলিতার্থ ফসল। বাংলা সাহিত্যে লৌকিক ধর্মশাখা ও বৈষ্ণব শাখার মানসফসল উঠেছিল স্বয়ং হুসেন শাহ এবং তাঁর বংশের সুলতানদের আমলেই।

এ যেমন এদেশীয় সাংস্কৃতিক উদ্বোধনের সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি ও ফলশ্রুতি লাভের কথা, অন্যদিকে বিদেশীয় শিল্পসংস্কৃতির সংস্পর্শে বিষয়বৈচিত্র্য, ভাবসম্পদ ও শব্দসঞ্চয়ে মুসলমানের অবদান অবশ্য স্বীকার্য। আরবী-ফারসী ভাষা ও সাহিত্য সে যুগের বাংলা সাহিত্যের সহিত তুলনায় অনেক উন্নত ছিল। সুলতানদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা ও ইসলাম ধর্মের প্রচারের সাথে কেবল ব্যবহারিক জীবনকে নয়, ভাষা ও সাহিত্যেও নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। সারা মধ্যযুগে যথার্থ মানবকাব্য হিন্দু কবিরা রচনা করেননি, ধর্মের আশ্রয় ছেড়ে কাব্য যে মানবমুখী হয়ে উঠতে পারে এ চিন্তা তাঁদের মনে স্থান পায়নি। কিন্তু মুসলমান কবিগণ প্রথম থেকেই হৃদয় বৃত্তির দাবী নিয়ে রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান রচনা করেছেন। আরব-পারস্যের সাহিত্যাদর্শ এর মূল উৎস ও অনুপ্রেরণা। শিল্প যে প্রয়োজনের সামগ্রী নয়, প্রয়োজনাতিরিক্ত রসভোগের বিষয়—বৈষ্ণব বা মঙ্গল কাব্যে তার পরিচয় নেই, অন্ততঃ স্বসম্প্রদায়ের স্রষ্টারা এবং সমসাময়িক পাঠকেরা তা মনে করতেন না। কাব্য রচনা ও কাব্য পাঠ দ্বারা প্রকারান্তরে ধর্মচর্চা ও দেবসেবার পরাকাষ্ঠা দেখাতেন বলে তাঁদের

বিশ্বাস ছিল। মুসলমানদের রচনায় প্রথম শিল্পবোধের নিদর্শন প্রতিষ্ঠিত হয়। আরবী-ফারসী শব্দের ব্যবহারে ভাষার সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে এ পর্বের উদ্যোগ ও সাধনাও শ্রদ্ধার সহিত স্মরণযোগ্য।

পরিশেষে বক্তব্য, বাংলা সাহিত্যে নাগরিক চেতনা। এটা নানা দিক কেন্দ্র করে সংঘটিত হয়েছিল। মুসলমান সুলতান, সওদাগর, সুফী, পীর, গাজী, প্রজা কর্তৃক বাহিত বিদেশী প্রভাব এবং এদেশের আভ্যন্তরীণ জীবনবোধের বিকাশ এর মূল উৎস ছিল। তাই এ যুগের বাংলা সাহিত্য যুগপৎ মানবমুখী ও নগরমুখী হয়ে উঠেছিল। ইসলাম ধর্মাদর্শ ও জীবনদর্শন যেমন বাঙালীর চিন্তাধারায় মানবিকতার আবেদন সঞ্চার করেছিল, মুসলিম বিজয় ও ক্ষমতাপ্রতিষ্ঠা তেমনি এদেশের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে নাগরিকতার প্রভাব মুদ্রিত করেছিল। চর্যাপদ রাজানুগ্রহ পায়নি, এমন কি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনও। এজন্য উভয় রচনায় ধর্মের নামে গ্রাম্যতা, স্থূল যৌনরুচির চিহ্ন রয়েছে। অবশ্য এদেশীয় জীবনব্যবস্থা ও ধর্মচর্যা এর মূলে ছিল, তথাপি নাগরিক প্রবর্তনায় সংস্কৃত সাহিত্যে যেরূপ অভিজাত প্রজ্ঞা শিল্পমণ্ডিত হয়েছে, বাংলা সাহিত্য প্রথম স্তরে তা থেকে বঞ্চিত ছিল। মুসলমান শক্তিপ্রতিষ্ঠার পর বাংলা দেশে নতুন নতুন নগর গড়ে ওঠে। শাসনকার্য ও বানিজ্যকে কেন্দ্র করে জনসাধারণের দৃষ্টি নগরের দিকে ধাবিত হয়। রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের বাইরে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী নিষ্ক্রিয় ভূমিকা নিয়ে বসবাস করলেও যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের ফলে এবং আর্থনীতিক সুবিধা লাভের জন্য একশ্রেণীর লোকে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে। গ্রামে ব'সেই প্রজাগণ রাজার উত্থানপতনের খবর রাখতো। ফুল্লশ্রীনিবাসী (বরিশাল) বিজয়গুপ্ত, হুসেন শাহের সিংহাসন লাভের অল্প পরে তাঁর 'মনসাবিজয়' কাব্য সমাপ্ত করেন। তিনি তাঁর কাব্যে সুলতানের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

'গৌড়' স্থায়ী রাজধানী ছিল (সুলতান আমল পর্যন্ত)। সোনারগাঁও ও 'চট্টগ্রাম' স্থানীয় শাসনকেন্দ্র ছিল। উক্ত তিনটি নগর এবং 'সপ্ত-গ্রামে'র বাণিজ্যিক গুরুত্বও ছিল। এসব জায়গায় রাজচর ও কর্মচারী থা'কতেন প্রতিনিধি হিসেবে। নতুন শাসনপদ্ধতি ও জীবনব্যবস্থার ঢেউ এসব কেন্দ্র থেকে গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ত।

খুব সম্ভব মানসলোকের এরূপ প্রসারতা ও সার্বিকতা লাভের ফলে বাংলার ধর্মাশ্রিত লৌকিক কাহিনীগুলি গ্রাম্যতা এবং আঞ্চলিকতা ছেড়ে আপামর জনসাধারণের আস্বাদ্য হয়ে উঠেছিল। ঐ একই সূত্রে শিল্পরূপ ও রুচিও অভিজাত মানদণ্ডে উন্নীত ও উত্তীর্ণ হয়েছিল। বাংলার গ্রামীণ সংস্কৃতির সংস্কার ও সংকর প্রবণতা যা সুলতান আমলে শুরু হয়েছিল, পরবর্তী মুঘল আমলে তার চরম পরিণতি লক্ষ্য করা যায়। কবি ভারতচন্দ্র এর প্রমাণ।

সুলতান আমলে বাঙালী মানসিকতায় নাগরিক চেতনার উন্মেষ ও নবীশের কথা ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন. "হিন্দুযুগে বাঙলার সংস্কৃতি প্রধানতঃ ছিল গ্রামীন; দেশের রাজধানীতে রাজা ও সামন্তবর্গ জ'াকাইয়া 'বার' দিয়া বসিলেও দেশের প্রাণশক্তি গ্রামেই নিহিত ছিল। কিন্তু ইসলামের ভূমাচারী জীবনাদর্শ, ওমরাহ্‌দের ভোগসুখের উদ্দামতা ইত্যাদির ফলে বাঙালীর শান্তস্নেহচ্ছায়াশীতল গ্রামীণ সংস্কৃতি ধীরে ধীরে নাগরিক সংস্কৃতির পথে অগ্রসর হইল।" (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ১ম খণ্ড, ১৯৫৯; পৃঃ ২৫০)।

রাজনৈতিক ও অর্থনীতিক পরিবর্তনসূত্রে সামাজিক জীবনব্যবস্থায় এরূপ ব্যাপ্তিকে তিনি উক্ত যুগ সীমায় প্রস্তুতিপর্ব বলে মনে করেছেন। বাঙালীর সমাজ জীবনে এটা প্রস্তুতিপর্ব হলেও, সাহিত্য জীবনে তা পূর্ণায়তই ছিল বলে আমাদের ধারণা। কেননা, কবিগণ অনেকে

রাজসভায় কর্মচারী ছিলেন, অনেকে গ্রামে থেকেও সুলতানদের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য পেয়েছিলেন। সুতরাং কি দরবারে, কি গ্রামাঞ্চলে আত্মসচেতন-শিল্পীর মানসলোকে বৃহতের ও মহতের স্পর্শ লেগেছিল। এজন্য 'ইউসুফ জুলেখা', 'রামায়ণ', 'মহাভারত', 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' অনূদিত শিষ্টরচনার সাথে 'মনসামঙ্গল', 'বিদ্যাসুন্দর' প্রভৃতি লৌকিক ধারার কাব্যও ধর্ম সমাজ-সম্প্রদায়-নির্বিশেষে সর্বাঞ্চলীয় জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। রাজছত্রচ্ছায়ায় বাংলার বালসাহিত্য এরূপে জন ছেড়ে জনতা, গোষ্ঠী ছেড়ে সমষ্টির সামগ্রী হয়ে ওঠে।

সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ

(১৩৯২-১৪১০ খ্রীঃ)

শাহ মুহম্মদ সগীর ॥ ইউসুফ-জুলিখা

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পর যে গ্রন্থখানি রচনার দিক থেকে প্রাচীনতা দাবী করতে পারে তার নাম 'ইউসুফ জুলিখা।' রচয়িতা শাহ মুহম্মদ সগীর। তিনি কাব্যরচনায় একজন 'রাজেশ্বরের' পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন, বন্দনা অংশে তাঁর গুণকীর্তন করেছেন। রাজার নাম ও পরিচিতি বিচারে কবির রচিত নীচের চরণ ক'টি লক্ষণীয় ঃ

"তিরতিএ পরনাম করোঁ রাজ্যক ইস্বর।
বাঘে ছাগে পানি খাএ নিভয় নিডর॥
রাজরাজস্বর মৈদ্ধে ধার্মিক পণ্ডিত।
দেব অবতার নির্প জগত বিদিত॥
মনুস্যের মৈদ্ধে জেহ্ন ধর্ম্ম অবতার।
মহানরপতি গ্যেছ পিরথিম্বীর সার॥
ঠাই ঠাই ইচ্ছে রাজা আপনা বিজএ।
পুত্র সিস্ত হস্তে তিঁহ মাগে পরাজএ॥
মহাজন বাক্য ইহ পুরণ করিআ।
লইলেন্ত রাজ্যপাট বঙ্গাল গৌড়িআ॥

করুণা হীদএ রাজা পুণ্যবন্ত তর।
সব গুণে অসীম অতুল্য মনুহর ॥
পুন্নিমার চান্দ জেহ্ন বচন সোন্দর।
মধুর মধুর বাণী কহন্ত সোসর ॥
রমণী বল্লভ নির্প রসে অনুপমা।
কনে বা কহিতে পারে সে গুণ মহিমা ॥
জিনিলা নৃপতি সব করিয়া সমর।
জএবাদ্য দুন্দুমি বাহন্ত উঞ্চসর ॥
ভক্তবৎসল নির্প বিপৈক্ষ বিনাস।
পরজা পালন করে জেহ্ন হাবিলাস ॥
জাবত জীবন মুঞি দেখিঁলুহি কাম।
তান ভক্ত বিনা ধিক নাহি আর ধাম ॥
মোহম্মদ ছগীর তান আজ্ঞাক অধীন।
তাহন আছুক জস ভুবন এ তিন ॥" [১]

উক্ত রাজপ্রশস্তির 'নরপতি গ্যেছ'কে ডঃ এনামুল হক সাহেব গৌড় সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ বলে উল্লেখ করেছেন। এ সম্পর্কে তাঁর অভিমত হল, বাংলা ইতিহাসে একমাত্র গিয়াসউদ্দিন আজম শাহই পিতা সিকন্দর শাহকে যুদ্ধে পরাজিত করে সিংহাসন দখল করেছিলেন।[২] তাঁর দ্বিতীয় মত, সুলতানের সাহিত্যরসজ্ঞ মন ছিল। প্রমাণ সাপেক্ষে তিনি সুলতানের গুণগ্রাহী আরও দুজন কবির স্বীকারোক্তি উল্লেখ করেছেন। তাঁরা হলেন মিথিলা কবি বিদ্যাপতি এবং সিরাজের কবি হাফিজ। আমরা দ্বিতীয় মতটি বিস্তৃত আলোচনা করতে চাই, কারণ বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগীয় কবিগণের

১. উদ্ধৃতি: মুসলিম বাংলা সাহিত্য – ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক, পৃঃ ৫৬—৫৭
২. ঐ পৃঃ ৫৭

মধ্যে শাহ মুহম্মদ সগীর যদি অন্যতম প্রাচীনতার মর্যাদা পান, তবে সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহও প্রথম পৃষ্ঠপোষক হিসেবে ঐতিহাসিক গুরুত্ব পাবেন তাতে সন্দেহ নেই। এটা প্রমাণ করতে হলে সুলতানের সাংস্কৃতিক মনের পরিচয় জানার প্রয়োজন আছে।

সুলতানের প্রশংসা করে পারস্যের কবি হাফিজ যে কবিতাটি পাঠিয়েছিলেন তার রচনার পরিপ্রেক্ষিত ভূমিকা হিসেবে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের আলোচনাটি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তিনি লিখেছেন,

"এক সময়ে পীড়িত হইয়া পড়াতে রাজার মনে হইয়াছিল তিনি আর বাঁচিবেন না, সুতরাং একটা উইল করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে লিখিত ছিল যে, তাঁহার প্রিয়তমা তিনটি অন্তঃপুরচারিণী—'সাইপ্রাস', 'গোলাপ' এবং 'তুলিপ' মৃত্যুর পর তাঁহার শব ধুইবার অধিকার পাইবেন। তাঁহাদের প্রতি রাজার এই অনুকম্পাপ্রদর্শনে তাঁহার অপরাপর উপরাজ্ঞীরা নিতান্ত ক্ষুণ্ণ ও হিংসাভাবাপন্ন হইয়া এই তিনটি মহিলাকে 'ঘোষালী' বলিয়া বিদ্রূপ করিতে লাগিল। ··· রাজা সারিয়া উঠিলেন। সেই রমণীত্রয় বিদ্রূপের কথা রাজাকে জানাইয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রাজা একটি কবিতা লিখিয়া তাঁহাদিগের মনস্তুষ্টিসাধনের চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু একটি ছত্র লিখিয়া তাহার জোড়া মিলাইতে পারিলেন না। যে ছত্রটি লিখিলেন তাহার অর্থ এই—"হে সুধা পাত্রধারিনি, তোমরা সাইপ্রাস, গোলাপ ও তুলিপের প্রশংসা গান কর।" এই কবিতা সম্পূর্ণ করিবার জন্য তিনি পারস্যের শ্রেষ্ঠ কবি হাফিজের নিকট দূত পাঠাইলেন। তিনি তাঁহার চিঠিতে উক্ত কবিকে বহু অর্থ দেওয়ার কথা বলিয়া বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করিতে অনুরোধ করিলেন। কথিত আছে, রাজার কবিতার প্রথম চরণ না দেখিয়াই হাফিজ দ্বিতীয় চরণটি লিখিয়া ফেলিয়াছিলেন, তাহার মর্ম এই—"এই সুসংবাদ তিনটি পরমা সুন্দরী

ও প্রিয়তমা "ঘোষালী"দিগকে জ্ঞাপন করা হউক। গয়েসউদ্দিনের পত্রের উত্তরে কবিবর যে সুন্দর কবিতাটি লিখিয়াছিলেন তাহা তাঁহার দিওয়ান নামক কাব্যগ্রন্থে অন্তর্নিবিষ্ট আছে।" [৩]

উদ্ধৃতাংশে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে, সুলতানের কবি প্রতিভা ছিল না, কিন্তু কবিজনোচিত মনোভাব ছিল। কবিতার চরণ লিখে ব্যথাহতা হারেমললনার মনস্তুষ্টিবিধানের চেষ্টায় একটি রসজ্ঞ মনের পরিচয় নিহিত আছে। দ্বিতীয়তঃ তিনি সুদূর পারস্য থেকে কবিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তাঁর রাজ্যে বা রাজসভায় আগমনের এবং স্থায়ী বসবাসের জন্য। সুতরাং তাঁর কাব্যানুরাগ প্রবল ছিল।

প্রায় দুশো বছর পরে রচিত 'আইন-ই-আকবরী' (আবুল ফজল কৃত) এবং আরো দুশো বছর পরের 'রিয়াজ-উস-সলাতীন' (গোলাম হোসেন সলিম রচিত) শীর্ষক বিখ্যাত ঐতিহাসিক গ্রন্থে হাফিজ কর্তৃক রচিত ও প্রেরিত কবিতার উল্লেখ আছে।

তিনি ফার্সি ভাষায় যে 'গজল' সুলতানকে লিখে উপহার পাঠিয়েছিলেন তার শেষ দুইটি চরণ নিম্নরূপ :

"হাফিয যে শওকে মজলিসে সুলতান গিয়াসদীন।
গাফিল ম-শওকেঃ কারে তু আযনালাঃ মী রওদ॥"

ডঃ শহীদুল্লাহ সাহেব এর বঙ্গানুবাদ করেছেন :

"হে হাফিয! গিয়াসুদ্দীন শাহের সভার বাসনা
ছেড়ো না, কাজ তোমারি কাঁদা-কাটায় চলিছে।" [৪]

মৈথিলী কবি বিদ্যাপতি (১৩৭০—১৪৭০ খ্রীঃ, অনুমিত) কর্তৃক রচিত সুলতানের প্রশস্তিবাচক চরণের উল্লেখ করেছেন ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেব :

৩. বৃহৎ বঙ্গ (২য় খণ্ড), পৃঃ ৬২১—২২

৪. বাংলা সাহিত্যের কথা, (মধ্যযুগ), পৃঃ ৫

"মহলম জুগপতি চিরে জীব জীবথু
গ্যাসদীন সুরতান॥" [৫]

বিদ্যাপতির উক্ত চরণের সহিত মুহম্মদ সগীরের নীচের চরণটির সাদৃশ্য আছে।

"মহানরপতি গোছ পিরথিম্বীর সার।"

১৪০৬ খ্রীষ্টাব্দে মা-হুয়েন নামে একজন চৈনিক পরিব্রাজক বাংলা রাজধানীতে (গৌড়) চীনা রাজপ্রতিনিধির দোভাষীর কাজ করেছিলেন বলে তাঁর রচিত ভ্রমণ-বৃত্তান্ত "Ying Yai Sheng Lan" গ্রন্থে উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি রাজধানীর নাগরিকজীবন ও সংস্কৃতির পরিচয় দান প্রসঙ্গে একস্থানে লিখেছেন,

"There is clan of musicians. These men go to the houses of big officials at 4 O'clock in the morning. When they commence their tune is always slow and generally increases to the end when it stops. They go from house to house, where they rescue presents of food and money." [৬]

উক্ত সময়ে গৌড়ের সিংহাসনে ছিলেন গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ। রাজধানীতে প্রকাশ্য সংগীত চর্চা হত—পেশাদার গায়কদের দল এবং তাদের জীবিকার্জনের পদ্ধতি থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়। প্রথম কথা সংগীতমূলক সংস্কৃতি চর্চায় সুলতানের সমর্থন ছিল। দ্বিতীয় কথা, মা হুয়েন গানের নাম উল্লেখ না করলেও গাওয়ার রীতি ও সুর বর্ণনা থেকে

---

৫. ঐ, পৃঃ ৫

৬. **Quot. from "Glimpses of old Dhaka by Syed Muhammed Taifoor. P. XXII.**

'গজল' অথবা 'কাওয়ালী' বলে অনুমিত হয়। মা-হুয়েন বলেছেন, "এদেশের জনসাধারণের ভাষা ছিল বাংলা, ফারসীও প্রচলিত ছিল।" শহরে ফারসী ভাষায় গজল বা কাওয়ালী গীত হওয়া স্বাভাবিক। কারণ শতাব্দীকাল হল মুসলমানেরা ইরান-তুরস্ক থেকে এসে এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। পারস্যের সহিত যোগাযোগ যে ছিল তা সুলতান কর্তৃক কবি হাফিজকে পত্র মারফত আমন্ত্রণ জ্ঞাপনে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয়। তিনি সুলতানকে 'গজল' লিখে উপঢৌকন দিয়েছিলেন। সুতরাং গৌড়ে ফারসী ভাষার কদর ছিল, সুলতান তা জানতেন এবং উক্ত ভাষায় রচিত 'গজল কাওয়ালী'র রসোপভোগ করতেন। মা-হুয়েনের উক্ত গ্রন্থে উল্লেখ আছে, সুলতান তিন দফায় (১৪০৫, ১৪০৮ এবং ১৪০৯ খ্রীঃ) চীন সম্রাট য়ং-লুর রাজদরবারে প্রচুর উপঢৌকনসহ দূত প্রেরণ করেছিলেন।

আমরা পূর্বে বলেছি, সুলতানের 'কবিমন' ছিল, 'কবিপ্রতিভা' ছিল না। কিন্তু তা ঠিক নয়। তাঁর সমসাময়িক ও প্রভাবশালী দরবেশ মজফফর শামস্ বল্খিকে লিখিত কয়েকটি ফরমান পাওয়া যায়, যেখানে সুলতান কর্তৃক রচিত একটি 'গজলে'র উল্লেখ দরবেশের পত্রোত্তরে সন্নিবেশিত হয়েছে। "Proceeding of the Nineteenth Session of Indian History Congress, 1956" থেকে শ্রীসুখময় বাবু উক্তি সংগ্রহ করে বাংলা তরজমা করে ভাষ্যসহ লিখেছেন,

"সম্ভবত গিয়াসুদ্দীন বল্খিকে একাধিক ফরমান পাঠিয়েছিলেন। একটি ফরমানের সঙ্গে তিনি বল্খির কাছে একটি পোশাক পাঠিয়েছিলেন।···আর একটি ফরমানের সঙ্গে গিয়াসুদ্দীন একটি গজল পাঠিয়েছিলেন তাতে বল্খির বিচ্ছেদে গিয়াসুদ্দীনের মনোবেদনা উচ্ছ্বাসপূর্ণ ভাষায় অভিব্যক্ত হয়েছিল। বল্খি এটি পড়ে বিহ্বল হন এবং সুলতানকে লেখেন, 'আমার হাতে কার্যের কর্তৃত্ব থাকলে আমি রাজার

৩—

এলাকা ছেড়ে চলে যেতাম না, কিন্তু ভগবানের ইচ্ছার কাছে মানুষের ইচ্ছা হার মানে। গজলের প্রত্যেকটি শব্দ এক একটি শর।'[৭]

'রিয়াজ-উস-সলাতীন' গ্রন্থেও সুলতান গিয়াসউদ্দীন ফরাসী কবিতা রচনা করতেন বলে উল্লিখিত আছে।[৮] ঐতিহাসিক সূত্র থেকে জানা যায়, সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ ন্যায়নিষ্ঠ, ধর্মপরায়ণ ও দানশীল ছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর আরবী পণ্ডিত আব্‌দ্‌ অল্‌ রহমান অল্‌ সখওয়ার মতে, সুলতান বহু টাকা ব্যয়ে মক্কায় 'উম্মে হানী ফটকে' এবং মদীনায় 'শান্তির ফটকে' দুটি মাদ্রাসা নির্মাণ করান।[৯] মাদ্রাসা ছাড়া সরাইখানা, খাল প্রভৃতি লোকহিতৈষিক সৎকাজ করেছিলেন বলে 'তারিখ-ই-মক্কা' (বিলগ্রামী কাজী কুতুবউদ্দিন হানাফী রচিত) গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। মুজফফর শামস্‌ বল্‌খির ধর্মীয় নির্দেশ তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেন। সে যুগের অন্য একজন প্রভাবশালী দরবেশ নূর কুতব্‌ আলমকে সুলতান মান্য ও শ্রদ্ধা করতেন। ঐতিহাসিকের মতে সুলতান তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন।[১০]

গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের উক্ত চরিত্র বৈশিষ্ট্য এবং শাহ মুহম্মদ সগীর প্রদত্ত 'গ্যছ' নরপতির রাজপ্রশস্তি এখন আমরা পাশাপাশি মিলিয়ে নিতে পারি। যিনি মক্কায় এবং মদীনায় মাদ্রাসা, সরাইখানা ও খাল নির্মাণ করিয়েছেন, যিনি পারস্য ও চীনে উপঢৌকনসহ দূত প্রেরণ করেছেন, যিনি ধর্মপ্রাণ দরবেশদের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন এবং তাঁদের ধর্মীয় নির্দেশ নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন, তিনি,

---

৭. বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর : স্বাধীন সুলতানদের আমল, ১৯৬২, পৃঃ ৯৩-৪/১

৮. **Journal of the Bihar Research Society, Vol. XLII, Part II.**

৯. **Social History of the Muslims in Bengal. Dr. Abdul Karim. P. 55.**

১০. **Ibid. P. 57-8.**

'রাজরাজস্ব মৈদ্ধে ধার্মিক পণ্ডিত।
দেব অবতার নির্প জগত বিদিত॥'

হবেন তাতে আর সন্দেহ কি? যিনি স্বয়ং কবি ও কাব্যামোদী, যিনি সভাকবি রাখতেন (রিয়াজ-উস-সলাতিনে উল্লেখিত) এবং যিনি সংগীতের ভক্ত ও পরিপোষক ছিলেন, তিনি,

'পুন্নিমার চান্দ জেহ্ন বচন সোন্দর।
মধুর মধুর বাণী কহন্ত সোসর॥'

এতেও আশ্চর্যের কোন কারণ নেই।

'রমণীবল্লভ নির্প রসে অনুপমা' চরণটি হারেম ললনাত্রয়ের উদ্দেশ্যে রচিত অসমাপ্ত ছত্র ক'টিকেই যেন সূচিত করে।

'ঠাই ঠাই ইচ্ছে রাজা আপনা বিজএ'
অথবা 'জিনিল নৃপতি সব করিয়া সমর।'

ইত্যাদি উক্তির সমর্থন ইতিহাসের পাতায় লেখা আছে। তিনি বিহার, কামতা, কামরূপ, আরাকান প্রভৃতি রাজ্যে বিজয়াভিযান চালিয়েছিলেন।

অলক্ষ্যে শরাহত বিধবার সন্তানের ক্ষতিপূরণ দিয়ে কাজীর দরবারে সুলতানের আইনের প্রতি শ্রদ্ধা ও নীতিপরায়ণতার যে দৃষ্টান্ত কিংবদন্তীরূপে প্রচলিত হয়ে আসছে তাতে সুলতান যে 'পরজা পালন করে জেহ্ন হাবিলাস।' এতে তারই অকুণ্ঠ স্বীকৃতি ও প্রতিসরণ। এখন যেহেতু 'মোহম্মদ সগীর তান আজ্ঞাক অধীন' সেহেতু তিনি কাব্যরচনায় সুলতানের আদেশ তথা অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ পেয়ে থাকবেন তা একান্ত স্বাভাবিক।

হস্তলিখিত পুঁথিতে 'গ্যছ' শব্দের লিপির অস্পষ্টতার অজুহাতে শ্রীসুখময় বাবু একে 'যেহ্ন' বা 'যেহ' শব্দের সম্ভাবনা অনুমান করেছেন। তাঁর অভিযোগ দুটি—ভাষায় অপেক্ষাকৃত অর্বাচীনতা এবং সুলতানের নামের সংক্ষিপ্ততা।

'ইউসুফ জুলিখার' ভাষা 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' থেকে অনেকখানি শুদ্ধ এবং আধুনিকীপ্রবণ। কিন্তু কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ'-এর ভাষার সহিত কতখানি পার্থক্য আছে তা বিচার করার আছে। কৃত্তিবাস ও সগীরের কাব্যরচনার কালসীমা সর্বাধিক তিন দশক। উক্ত সময়ের মধ্যে ভাষার পার্থক্য খুব বেশী হওয়ার কথা নয়। সম্মানার্থে 'ন্ত'—অন্ত্যক ক্রিয়াপদ গঠন (**লইলেন্ত** রাজ্যপাট বঙ্গাল গৌড়িআ—সগীর॥ আচম্বিতে **শুনিলেন্ত** কুক্কুরে ধ্বনি—কৃত্তিবাস), উত্তম পুরুষে অতীতকালে উন্নাসিক 'চন্দ্রবিন্দু' (ঁ) যোগে ক্রিয়াপদের ব্যবহার ('কিতাব কোরান মধ্যে **দেখিলুঁ** বিশেষ'—সগীর॥ 'নানা মতে নানা শ্লোক **পঢ়িলোঁ।** রসাল'—কৃত্তিবাস), সর্বনামপদের অভিন্ন রূপ প্রয়োগ (পুত্র সিস্য হন্তে **তিঁহ** মাগে পরাজএ—সগীর॥ রাজসভা পূজিত **তিঁহ** গৌরব অপার—কৃত্তিবাস) এবং আধুনিক বিশেষ্যপদ ব্যবহারের সাদৃশ্যমূলক দৃষ্টান্ত উভয়ের রচনায় লক্ষ্যগোচর হয়। 'আহ্মি'র প্রয়োগ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আছে, 'ইউসুফ জুলিখা'তেও সচরাচর দেখা যায়, রামায়ণে দেখা যায় না। সুতরাং ভাষার অজুহাতে শাহ মুহম্মদ সগীরকে ষোড়শ শতকের কবি বলে অভিহিত করলে কৃত্তিবাসকেও উক্ত কালসীমায় ফেলতে হয়। পরবর্তী লিপিকারের হস্তক্ষেপ ও ভাষার প্রক্ষেপ উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সুতরাং মুহম্মদ সগীরকে গিয়াসউদ্দিন মুহম্মদ শাহের (১৫৩৩-১৫৩৮ খ্রীঃ) পৃষ্ঠপোষকতাদানের অনুমানের চেষ্টা ভ্রমাত্মক। বিশেষতঃ উক্ত সুলতানের যখন সংস্কৃতি ভাবাপন্নতার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

শ্রীসুখময় বাবু লিখেছেন, "পৃষ্ঠপোষক রাজার নামকে এরকম সংক্ষেপে ও বিকৃতভাবে কোনক্রমে মাত্র এক জায়গায় উল্লেখ করে চলে যাওয়া দস্তুরমত অস্বাভাবিক ব্যাপার।"[১১] অতএব তাঁর মতে গ্যেছ—

১১. বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর: স্বাধীন সুলতানদের আমল, পৃঃ ১১১/১

গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ হতে পারেন না। কিন্তু আমাদের মতে ব্যাপারটা অস্বাভাবিক নয়। ছন্দের ও মাত্রার সামঞ্জস্য রক্ষা করতে স্থলতানের বড় ও অবাঙ্‌লা নামের সংক্ষেপ হওয়া স্বাভাবিক। শাহ মুহম্মদ সগীরের সমস্ত 'আত্মচরিতটা' সংক্ষিপ্ত (চারটি স্তবকে সমাপ্ত)। সুতরাং স্থলতানের নাম একাধিক স্থলে উচ্চারণ করার অবকাশ কোথায় ?

দ্বিতীয়তঃ, বিদ্যাপতির 'প্রভু গ্যাসদেব সুরতান' ছত্রাংশে পুরোনামের সংক্ষেপ 'গ্যাস' এর সহিত 'দেব' যোগ করা হয়েছে। সুতরাং বিদ্যাপতির 'যুগপতি গ্যাস' যদি স্থলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ হন, তবে শাহ মুহম্মদ সগীরের 'নরপতি গ্যেছ' স্থলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ হবেন না এর পেছনে এমন কি অসংগতি থাকতে পারে।

ডঃ এনামুল হক সাহেব লিখেছেন, "গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের আদেশে কবি "য়ূসুপ-জলিখা" রচনা করেন নাই ; অন্ততঃ তাঁহার কাব্যে সে বিষয়ে কোন স্পষ্ট উল্লেখ নাই।" [১২] কিন্তু যে স্থলতানের তিনি 'আজ্ঞাক অধীন' এবং যাঁর 'ভক্তি বিনা ঠিক নাহি আর ধাম' কাব্য-রচনায় তাঁর সমর্থনে অভাব ছিল বলে মনে হয় না, আর 'তিরতিএ' স্তবকে রাজ-বন্দনাও অর্থহীন ছিল। স্থলতানকে খুসী করার যদি প্রচ্ছন্ন মনোভাব কবির থেকে থাকে তবে তাঁর অনুগ্রহ লাভের বাসনাতেই করেছেন। তাই স্থলতান আদেশ বা উৎসাহ দেননি, এমন মনে করার কারণ থাকতে পারে না।

উপরন্তু, 'চতুর্থ' স্তবকে কবি স্পষ্টতঃ স্বীকার করেছেন কাব্যরচনার মূলপ্রেরণা ধর্মবোধ—'প্রেমরসে ধর্মবাণী কহিনু ভরিয়া।' আরবী-ফারসী ছাড়া 'দেশীয় ভাষায়' ধর্মপ্রচারে আপত্তি ওঠার কথা। স্বয়ং কবির মনে দ্বিধা ছিল—'পাপ ভয় এড়ি লাজ দৃঢ় করি মন।' 'ন লেখে কিতাব কথা মনে ভয় পাএ। দোষিব সকল তাক ইহ ন জুয়াএ॥'

১২. মুসলিম বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ৫৮

তথাপি কবি যখন 'দেশী ভাষায়' ধর্মবাণী লিখেছেন এবং পাঠক মহলের প্রতিবাদেরও কোন উল্লেখ নেই, বরং ক্ষমা পাওয়ার ভরসা আছে তখন সুলতানের অনুগ্রাহিতা এবং ভাষা নির্বিশেষে ধর্মপ্রচারে উদার দৃষ্টিভংগির একটা পরোক্ষ ইংগিত ছিল বলে অনুমিত হয়। সুলতানের ইচ্ছার প্রতিবাদের সাহস সেকালের সাধারণ প্রজাদের ছিল না।

'ইউসুফ-জুলিখা' কাব্যে নাগরিক জীবনের রস ও রুচির পরিচয় ফুটে উঠতে পারত, যদি বিষয় নির্বাচনে কবি মৌলিকতা গ্রহণ করতেন। কবির বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে সমসাময়িক জীবনোপকরণ, সাংস্কৃতিক তথ্য সংগ্রহে আমাদের সুবিধে হত। 'কিতাব কোরান' থেকে কাব্যের মূল কাহিনী নির্বাচন করেছেন। ডঃ শহীদুল্লাহ সাহেব কাব্যখানিকে ফারসীর 'অনুবাদ সাহিত্যের' পর্যায়ে ফেলেছেন।[১৩] কিন্তু প্রকৃত ঘটনা পবিত্র কোরানে এবং বাইবেলে বর্ণিত। কবি ইংরেজী জানতেন না নিশ্চয়, কিন্তু আরবী জানতেন। ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ফারসী ভাষায় রচিত গ্রন্থ থেকে জেনেছেন। কবির আবির্ভাবের পূর্বে একমাত্র ফিরদৌসীর একই বিষয় নিয়ে রচিত ফারসী কাব্য পাওয়া যায়। সুতরাং অনুবাদ করে থাকলে উক্ত কাব্যখানিরই করা উচিত। কিন্তু শাহ মুহম্মদ সগীর তা করেননি, করলে আত্মপরিচয়ে ঋণ স্বীকার করতেন। আমাদের মনে হয়, সগীরের 'য়ুসুফ-জলিখা' ঠিক অনুবাদ সাহিত্য নয়, শাস্ত্রীয় উপাখ্যানের ওপর ভিত্তি করে কাব্যরচনা করেছেন এবং প্রয়োজন ক্ষেত্রে ঘটনা বিশেষের ওপর স্বাধীন হস্তক্ষেপও করেছেন। (মধুপুরের রাজকন্যা বিধুপ্রভা অংশটি স্মরণীয়)। সুতরাং 'ধর্মবাণী' বলতে গিয়ে 'প্রেমবাণী' তথা 'কাব্যরস' সৃষ্টি করেছেন তা সহজে অনুমেয়। বস্তুতঃ 'য়ুসুফ-জলিখা' ধর্মীয় ভাবাবরণে কাব্যিক প্রণয়োপাখ্যান।

১৩. দ্রষ্টব্য: বাংলা সাহিত্যের কথা, (মধ্যযুগ) পৃঃ ৩২৬

এখানে কবির ব্যক্তি-অভিজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ ছিল। কবি তা গ্রহণ করলে দরবারের রস-রুচির পরিচয় পাওয়া যেত। ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যখানি নদীয়ার রাজসভাকে জানবার একটা প্রশস্ত ক্ষেত্র রচনা করেছে। শাহ মুহম্মদ সগীর ইউসুফ ও জলিখার প্রেমচিত্রণে ধর্মীয় নিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন এতে একাধারে কবির সংযমবোধ, অন্যধারে দরবারের শালীনতাবোধেরও সংকেত জ্ঞাপিত হয়। গিয়াস-উদ্দীন আজম শাহের মত ধর্মপ্রাণ সুলতানের অনুগ্রহপুষ্ট কবির কাব্যে এটা স্বাভাবিক এবং যথার্থ।

উপসংহারে বলতে হয়, শাহ মুহম্মদ সগীর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম কবি যিনি গৌড় রাজসভাভুক্ত থেকে এবং সুলতানের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে কাব্যরচনা করেছিলেন; কিংবা ঘুরিয়ে বলা যায়, সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ প্রথম গৌড়েশ্বর যিনি বাঙালী কবিকে কাব্যরচনায় অনুগ্রহ ও অনুপ্রেরণা দান করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্য-ভাণ্ডারের ঊষার স্বর্ণদ্বার উন্মুক্ত হল, শুরু হল শুভ জয়-যাত্রা। ধর্মোপাখ্যান কাব্যোপকরণ হতে পারে মধ্যযুগের ধর্মাশ্রিত বাংলা সাহিত্যের একটা নিটোল নিদর্শন আলোচ্য কাব্যখানি। পরবর্তী কবিরা যে এখান থেকে আদর্শ ও অনুপ্রেরণা লাভ করেননি, তার নিশ্চয়তা কে দিবে? 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' দরবারপুষ্ট কাব্য নয়, এর প্রচারও বহুল ছিল না। থাকলে মুহম্মদ সগীর কাব্যখানি দ্বারা প্রভাবিত হতে পারতেন। কিন্তু আমরা বলেছি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র রুচিহীনতার লেশমাত্র চিহ্ন 'য়ুসুফ-জলিখার' কাব্যে নেই। 'য়ুসুফ-জলিখা'র সহিত কৃত্তিবাসের পরিচয় যদি নাও থাকে, কবির পৃষ্ঠপোষক সুলতানের ছিল। সুতরাং তাঁর কাব্য ধর্মীয়কাব্য হবে এবং রুচিসম্মত হবে তাতে সন্দেহ থাকতে পারে কি? পরোক্ষ হোক, প্রত্যক্ষ হোক, পরবর্তী ধর্মীয় কাব্যশাখার ওপর 'য়ুসুফ-জলিখা'র একটা নীরব হাতছানি ছিল।

সুলতান জালালউদ্দীন মুহম্মদ শাহ
(১৪১৮—৩১ খ্রীঃ)

কৃত্তিবাস ॥ রামায়ণ

গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের আট বছর পর জালালউদ্দীন মুহম্মদ শাহ গৌড়ের সিংহাসনে বসেন। এই আট বছর বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস অশান্তিপূর্ণ ছিল। ইতিমধ্যে চারজনের হাতে গদি বদল হয়—সুলতান সরফুদ্দীন হামজা শাহ (১৪১০-১১ খ্রীঃ) সুলতান সিহাবউদ্দীন বায়জিদ শাহ (পোষ্যপুত্র, ১৪১২-১৩ খ্রীঃ), সুলতান আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ (১৪১৪ খ্রীঃ) এবং রাজা গণেশ (১৪১৪-১৮ খ্রীঃ)। স্থানীয় হিন্দু জমিদার গণেশ কর্তৃক গৌড়ের সিংহাসন দখল একটা মারাত্মক রাজনৈতিক বিপর্যয়। বাংলা দেশ হতে মুসলিম ক্ষমতা অবলোপের চেষ্টা রাজা গণেশের সফল হলে এদেশের ইতিহাস অন্যভাবে লিখিত হত। হয়নি সারা ভারতেই মুসলিম ক্ষমতা তখন দুর্বার ও দুর্জেয় ছিল বলে। দুশো বছরের রাজত্বে মুসলিম শাসনের শিকড় দেশের গভীরে প্রবেশ করেছিল; তা ছিন্নমূল করতে পর্যাপ্ত বাহুবল রাজা গণেশ কেন, সমগ্র হিন্দু জাতির ছিল না। গণেশ তবু ছাড়বার পাত্র নন, আত্মজের ধর্মান্তকরণে সন্ধি করলেন, তবু সিংহাসন ছাড়লেন না—চেয়েছিলেন 'বাঙালীত্বের' বীজ রোপিত হোক। হিন্দু

যদু ধর্মান্তরিত হয়ে জালালউদ্দীন নাম নিয়ে সিংহাসনে বসলেন। জাতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি সুলতানের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা থাকা স্বাভাবিক। তিনি সে ভূমিকা কি পরিমাণ পালন করেছেন, এখন তা'ই বিচার্য।

সুলতান জালালউদ্দীন আদি বাংলা রামায়ণ-রচয়িতা কৃত্তিবাসের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন। তর্কাতীত প্রমাণিত হয়নি এজন্য যে, কৃত্তিবাস যে 'গৌড়েশ্বরের' সাক্ষাৎ ও কাব্যরচনায় আজ্ঞা লাভ করেছিলেন তাঁর নাম উল্লেখ করেননি। আত্ম-পরিচয়ে কেবল রাজসভার বর্ণনা করেছেন।

আলোচনায় প্রবেশের আগে কবিকৃত প্রয়োজনীয় অংশটুকু উদ্ধৃত করা সমীচীন মনে করি। এতে কবির রাজদর্শন, রাজসভা বিবরণ এবং রাজ সম্বর্ধনা লাভের চিত্রগুলি স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে।

"রাজ পণ্ডিত হৈব মন আশা করে।
সাত শ্লোক ভেটিলা রাজা গৌড়েশ্বরে॥
দ্বারিহস্তে শ্লোক দিয়া রাজাকে জানালাম।
রাজাজ্ঞা অপেক্ষা করি দ্বারেতে রহিলাম॥
সপ্ত ঘটি বেলা যখন দগড়ে পড়ে কাঠি।
শীঘ্র ধাই আইল দ্বারী হাথে স্বর্ণলাঠি॥
কার নাম ফুলিয়ার পণ্ডিত কৃত্তিবাস।
রাজার আদেশ হৈল করহ সম্ভাষ॥
নয় বিহন্দ পার হৈয়া গেলাম দরবারে।
সিংহসম দেখি রাজা সিংহাসন পরে॥"

এর পর কবি রাজার কয়েকজন পার্শ্বচরের নাম করেছেন। তারপর লিখেছেন,

"রাজ সভাখান যেন দেব অবতার।
দেখিয়া আমার চিত্তে লাগে চমৎকার॥

পাত্রেতে বেষ্টিত রাজা আছে বড় সুখে।
নানা লোক দাণ্ডাইয়া রাজার সমুখে ॥
চারিদিকে নাট্যগীত সর্বলোকে হাসে।
চারিদিকে ধাওয়া ধাই রাজার আওয়াসে ॥
আঙ্গিনায় পাতিয়াছে রাজা যে মাজুরি।
তার উপর পাতিয়াছে নেতের পাছুড়ি ॥
পাটের চান্দয়া শোভে মাথার উপর।
মাঘ মাসে খরা পোহায় রাজা গৌড়েশ্বর ॥
দাণ্ডাইলুঁ গিয়া আমি রাজা বিদ্যমান।
নিকটে যাইতে রাজা দিল হাথ সান ॥
রাজা আজ্ঞা কৈল পাত্র ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
রাজার সম্মুখে আমি গেলাম সত্বরে ॥
রাজা ঠাঞি দাণ্ডাইলোঁ হাথ চারি অন্তরে।
সাত শ্লোক পঢ়িলাহোঁ শুনে গৌড়েশ্বরে ॥

....

নানা ছন্দে শ্লোক আমি পঢ়িএ সভায়।
শ্লোক শুনি গৌড়েশ্বর আমা পানে চায় ॥
নানা মতে নানা শ্লোক পঢ়িলো রসাল।
খুসি হৈয়া মহারাজা দিলা পুষ্পমাল ॥
কেদার খাঁ শিরে ঢালে চন্দনের ছড়া।
রাজা গৌড়েশ্বর দিলা পাটের পাছড়া ॥
রাজা গৌড়েশ্বর বলে কিবা দিব দান।
পাত্র মিত্র বোলে রাজা যা হয় বিধান ॥
পঞ্চগৌড় চাপিয়া গৌড়েশ্বর রাজা।
গৌড়েশ্বর পূজা কৈলে গুণের হয় পূজা ॥
পাত্র মিত্র সভে বোলে শুন দ্বিজরাজে।
যাহা ইচ্ছা হয় তাহা চাহ মহারাজে ॥

কার কিছু নাঞি লই করি পরিহার।
যথা যাই তথাই গৌরবমাত্র সার॥
....
সন্তুষ্ট হইয়া রাজা দিলেক সন্তোক।
রামায়ণ রচিতে করিলা অনুরোধ॥"[১]

অনেকে কৃত্তিবাসের পৃষ্ঠপোষক রাজা হিসেবে গণেশের নাম করেন। শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় কৃত্তিবাসের জন্মসূচক একটি চরণের ("আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘ মাস") সূত্রাবলম্বনে জ্যোতিষ-গণনান্তর প্রথমে স্থির করলেন ১৪৪৩ খ্রীষ্টাব্দে কবির জন্ম। কিন্তু এতে রাজা গণেশের আমল ফেলা যায় না, সেজন্য 'পূর্ণ মাঘ মাস' স্থলে 'পুন্য মাঘ মাস' ধরে সংশোধন সন নির্ণয় করে ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্মকাল স্থির করেছেন। কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণী মতে, তিনি ১২ বছরে অর্থাৎ ১৪১০ খ্রীষ্টাব্দে শিক্ষা লাভ করতে যান। রাজা গণেশের রাজসভায় যেতে হলে সবচেয়ে বেশী সময় ধরলে আট বছরের মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষা শেষ, ও পাণ্ডিত্য অর্জন করা প্রয়োজন। কৃত্তিবাস শিক্ষা শেষ করেই রাজ দরবারে যাননি, গুরু-দক্ষিণা দিয়ে 'ঘরকে গমন" করেছিলেন। সেখানে তাঁর পাণ্ডিত্য স্বীকৃত ও প্রচারিত হলে পর এক সময় 'রাজপণ্ডিত' হবার সাধ জন্মেছিল এবং তখনই তিনি গৌড়ে আগমন করেছিলেন। কৃত্তিবাসের অসাধারণ মেধা স্বীকার করে নিয়ে যদি উক্ত সময়ের মধ্যে পাঠ সমাপন ও পাণ্ডিত্য অর্জন সম্ভব হয় তবে তিনি রাজা গণেশের সহিত সাক্ষাৎ করলেও করতে পারেন।

সুবিধাবোধে ও আত্মতোষ-লাভার্থে ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন, ডঃ সুকুমার সেন, ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ পণ্ডিতগণ ঐ সংশোধনী

---

১. উদ্ধৃতি: ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্,- "বাংলা সাহিত্যের কথা" (মধ্যযুগ) পৃঃ ৪০০—৪০৩

সালটি লক্ষ্য করে এবং একটা অসম্ভাব্য সময়সংক্ষেপ উপেক্ষা করে মোটামুটিভাবে গণেশের যুগকেই সমর্থন করেছেন। শ্রীসুখময় বাবু প্রথমে এ ভ্রমে পড়েছিলেন 'রাজা গণেশের আমল গ্রন্থে' পরে স্বমত পাল্টে 'বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর : স্বাধীন সুলতানদের আমল' গ্রন্থে কৃত্তিবাসের অনুগ্রাহক সুলতান রুক্‌নুদ্দীন বরবক শাহকে নির্ধারিত করেছেন। তিনি সর্বশেষ মত প্রতিষ্ঠায় রাজসভার অমাত্যদের (বিশেষতঃ কেদার রায়, গন্ধর্ব রায় ও নারায়ণ) বিভিন্ন সূত্র থেকে আবির্ভাব সম্ভাবনা আনুমানিক কালের ওপর জোর দিয়েছেন। সমসাময়িক চৈনিক পর্যটক ফেইসিনের রাজসভার বিবরণ ও কৃত্তিবাসের বর্ণনার মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ্য করে যাঁকে রাজা গণেশ বলে মনে করেছিলেন, পরে উক্ত পর্যটকের বর্ণনার নির্ভুলপাঠ গ্রহণে যখন দেখা গেল, চীনাপ্রতিনিধিদের আপ্যায়িত ভোজ সভায় 'গরুর গোস্‌ত' পরিবেশিত হয়েছিল এবং 'মদ্যপান' নিষিদ্ধ ছিল তখন বাধ্য হয়ে প্রথম মতটি প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর জটিল ও শ্রমসাধ্য মতগুলি আলোচনা করা যেত, কিন্তু তিনি নিজেই দোলাচলচিত্ততায় আচ্ছন্ন বলে তা ত্যাগ করে আমরা প্রয়োজনীয় বিষয় আলোচনা করি।

আমরা প্রথমেই বলে নিচ্ছি, কৃত্তিবাস রাজা গণেশের রাজসভায় যাননি বা তাঁর অনুগ্রহ লাভ করেননি। এর সহজ কতকগুলো কারণ হল, রাজা গণেশের মাত্র চার বছরের রাজত্বকাল অশান্তিপূর্ণ ছিল। কোন সূত্র থেকে জানা যায় না, গণেশ দেশীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নতির চেষ্টা করেছেন। দ্বিতীয়তঃ, তিনি কবিকে বাংলা ভাষায় রামায়ণ রচনা করতে অনুরোধ করতে পারেন না। তিনি নিজে ব্রাহ্মণ (মতান্তরে কায়স্থ), তাঁর সভাসদেরা অনেকে ব্রাহ্মণ ছিলেন। দেশীয় ম্লেচ্ছ ভাষায় ধর্মশাস্ত্র লেখার অনুমতি তিনি দিতে পারেন এমন মানসিক মুক্তি হিন্দু সমাজের তখনও জন্মেনি। কথিত আছে, 'সুবর্ণধেনু'

প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পুত্র যদুকে আবার হিন্দুত্বে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিলেন গণেশ। কিন্তু হিন্দু সমাজের সমর্থন পাননি।[২] সুতরাং ব্রাহ্মণ তখনও ধর্মের গোঁড়ামী ও রক্ষণশীলতা নিয়ে অহংবোধ বজায় রেখেছিলেন। তৃতীয়তঃ, কৃত্তিবাস আট/নয় জন হিন্দু রাজ অমাত্যের নাম করেছেন, কিন্তু একজনও মুসলমান অমাত্যের নাম করেননি। তিনি পূর্ব থেকে যদি হিন্দুদের জানতেন ও চিনতেন, তবে মুসলমানদের জানা-চেনার কথা। সাঙ্গপাঙ্গদের সবার নাম করলেন হিন্দু, কিন্তু রাজার নাম করলেন না। গণেশ হলে শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করতেন, তাঁর বিস্তৃত আত্মপরিচয়ে তার অবকাশ ছিল। পণ্ডিতেরা মনে করলেন, তাঁর গ্রন্থে 'যবনচিহ্ন' রাখবেন না বলে যবন সুলতানের নাম উচ্চারণ সমীচীন মনে করেননি। সুতরাং কৃত্তিবাসের 'গৌড়েশ্বর' গণেশ নন, হয়ত গণেশপুত্র জালালউদ্দীন।

ডঃ অসিত বাবু লিখলেন, "গণেশের পুত্র যদু জালালউদ্দীন নাম ধারণ করিয়া ১৪১৮ খ্রীঃ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দুসমাজের প্রতি, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের প্রতি বিরূপ হইয়াছিলেন, এবং অনেক ব্রাহ্মণকে বলপূর্বক মুসলমান করিয়াছিলেন। সুতরাং কৃত্তিবাস জালালউদ্দীনের সভায় যান নাই।"[৩] কিন্তু তাঁর এ মত নিতান্ত অমূলক এবং স্ববিরোধী। সুলতান জালালউদ্দীন সংস্কৃত টীকাকার বৃহস্পতি মিশ্রকে কয়েকবার উপাধি দিয়েছিলেন এবং প্রচুর উপঢৌকন দিয়েছিলেন। তিনি সুলতানকে 'গৌড়াবনীবাসব' বলে শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছিলেন। বৃহস্পতি হিন্দু ছিলেন। ঐতিহাসিকের মতে, সুলতানের প্রধান অমাত্য ছিলেন একজন হিন্দু। সুতরাং জালালউদ্দীন হিন্দুনিপীড়ক ছিলেন এবং সে ভয়ে কৃত্তিবাস তাঁর রাজসভায় যেতে পারেন না,

২ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (.ম খণ্ড) ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ২৩৫

৩ ঐ, পৃঃ ৫০৪

ডঃ অসিত বাবুর এমত অর্থহীন ও ভিত্তিহীন। বরং বলা যায়, বৃহস্পতিকে উপাধিতে ভূষিত ও অর্থে পুরস্কৃত করার সংবাদ অবগত হয়েই কৃত্তিবাসের মনে 'রাজপণ্ডিত' হওয়ার বাসনা জন্মে। গৌড়দরবারে এ-উদ্দেশ্যেই তো গমন করেছিলেন তিনি।

কেউ কেউ কেদার খাঁকে কাদের খান (Quadar Khan) বলে মুসলমান প্রতিপন্ন করতে চান, কিন্তু তিনি মুসলমান নন। তিনি কৃত্তিবাসকে চন্দনের ছড়া'য় সম্মানিত করেছিলেন। এটা হিন্দুয়ানী রীতি। এতসব হিন্দু অমাত্য থাকতে একজন মুসলমান গেলেন হিন্দু আচারে কবিকে ভূষিত করতে! তা'ছাড়া ব্রাহ্মণ কবি 'যবনের' হাতে অভ্যর্থিত হতে যাবেন কেন? রাজভয়? কবি যবনরাজার পুরস্কার পর্যন্ত নেন্‌নি, ডঃ সুকুমার সেনের তা'ই অনুমান। তখনও রাজভয় ছিল। কৌশলে এড়িয়েছেন মাত্র। এটাও এড়াতে পারতেন পণ্ডিত হিসেবে।

ডঃ অসিত বাবু 'রাঙ্গা মাজুরির' উপর 'নেতের পাছুড়ি' পেতে 'খরা' পোয়ার চিত্র দেখে মন্তব্য করেছেন, "রাজা গণেশ হিন্দু রাজা; বাঙলা দেশের হিন্দু রাজাগণ ঐশ্বর্যের দম্ভ প্রদর্শনের জন্য বিখ্যাত হন নাই। বরং পাঠান এবং মুঘলযুগের সুলতান ও শাসনকর্তারাই ঐশ্বর্য সমুদ্রে আকণ্ঠ মগ্ন হইয়া থাকিতেন। সুতরাং কৃত্তিবাস-বর্ণিত গৌড়েশ্বরের রাজসভা যদি গণেশেরই রাজসভা হয়, তাহা হইলে তাহার অনলঙ্কৃত বর্ণনা এমন কিছু অস্বাভাবিক হয় নাই।" [৪] কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদের ভিন্ন বক্তব্য আছে। কৃত্তিবাস প্রথমে রাজাকে সিংহাসনে 'সিংহসম' বসে থাকতে দেখেছিলেন। আবার পরে বলেছেন, 'নেতের পাছুড়ি' বা সুতীবস্ত্রের উপর বসেছিলেন। নিচে 'রাঙ্গা মাজুরি', উপরে 'পাটের চান্দয়া'। এতে ঐশ্বর্যের দম্ভ নেই। অতএব রাজা গণেশের রাজসভা হওয়া স্বাভাবিক—ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের এ মত পারম্পর্য

৪. ঐ, পৃঃ ৫০৪-৫

বিচারহীন। রাজা লক্ষ্মণ সেন সোনার থালা ছাড়া ভাত খেতেন না। যে 'দ্বারী' কৃত্তিবাসকে দরবার অভ্যন্তরে নিয়ে গেছিল তার হাতে 'সুবর্ণ লাঠি' ছিল। এতো ঐশ্বর্যের অহঙ্কারই! সুলতান যেখানে বসেছিলেন তা প্রকৃত দরবার কক্ষ নয়, রৌদ্রোপভোগ উপযোগী অস্থায়ী ব্যবস্থা মাত্র। সুতরাং তা যাঁরই হোক, সাধারণ আয়োজন হবেই।

ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন, কৃত্তিবাস যে সুলতানের সাক্ষাৎ পান, তিনি বাংলা ভাষা জানতেন না, পাত্রমিত্ররা দোভাষীর কাজ করেছিলেন। এ মতের সপক্ষে নিম্নের চরণ দুটি প্রযোজ্য মনে করেছেন:

"নিকটে যাইতে রাজা মোরে দিল হাথ সান॥
রাজা আজ্ঞা কৈল পাত্র ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।"

কিন্তু এ চরণদ্বয়ের প্রকৃত ব্যাখ্যা ভিন্ন। পাত্রমিত্র বেষ্টিত হয়ে সুলতান নবাগত আগন্তুককে কখনো চীৎকার করে ডাকতে পারেন না। এটা শিষ্টাচার বিরোধী। তাঁরা অনেক সময় হাত, চোখ ইত্যাদির ইসারায় মনোভাব ব্যক্ত করে থাকেন, উজির-নাজির আর পরিচারকেরা তার অর্থ বুঝে তদনুপাতে কাজ করেন। কৃত্তিবাসের গৌড়েশ্বরের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটি প্রযোজ্য। তিনি বাংলা পুরোপুরি জানতেন। কবি মাত্র চার হাত ফারাকে দাঁড়িয়ে আছেন এবং কবিতার ছন্দে স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি একাধিক চরণে লিখেছেন,

"সাত শ্লোক পঢ়িলাহোঁ শুনে গৌড়েশ্বরে॥"
"নানা ছন্দে শ্লোক আমি পঢ়িএ সভায়।
শ্লোক শুনি গৌড়েশ্বর আমা পানে চায়॥"
"নানা মতে নানা শ্লোক পঢ়িলো রসাল।
খুসি হৈয়া মহারাজা দিলা পুষ্পমাল॥"

কবির উপস্থিত মত তৈরী 'রসাল শ্লোক' যিনি বুঝতে পারেন এবং বুঝে 'খুসি' হন, তিনি কেবল বাংলা জানেন না, তাঁর বাংলা কাব্যের রসবোধেরও শক্তি আছে। ধর্মান্তরিত খাঁটি বাঙালী মুসলমান সুলতান হিসেবে জালালউদ্দীনের পক্ষে বাংলা ভাষার উপর এরূপ দখল থাকা সম্ভব। ভাতুড়িয়ার (দিনাজপুর) জমিদারপুত্র জালালউদ্দীনের এদেশের ভাষা, জীবন ও সাহিত্যের ওপর স্বাভাবিক দরদ ও আগ্রহবোধ থাকার কথা। সুতরাং তিনি বাংলা ভাষায় রামায়ণ রচনায় কৃত্তিবাসকে 'অনুরোধ' করবেন তাতে আশ্চর্যের কি! রাজার নির্দেশ তিনি অমান্য করতে পারেন না। ব্রাহ্মণের নিষেধাজ্ঞার তুলনায় রাজাজ্ঞা আরও কঠোর। অনেকে মনে করেন, কৃত্তিবাস গুরুর 'আজ্ঞা' ও 'আশীর্বাদ' নিয়ে বাংলা রামায়ণ রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন। যদি আগেভাগে রচনাকাজ শুরু করে থাকতেন, তবে রাজার কাছে তা ব্যক্ত করতেন। 'রাজপণ্ডিত' হওয়ার আশায় দরবারে এসেছেন, অতএব রাজনির্দেশ শিরোধার্য ছিল। কৃত্তিবাস অর্থগৌরব চাননি, কাব্যগৌরব কামনা করেছেন। কবিযশঃ প্রার্থীকে সুলতান কাব্যরচনা করতেই নির্দেশ দিলেন। কাব্যরচনা শুরু করে থাকলে উপাধি পেতেন, সুলতান উপাধিদানে যখন সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

সংস্কৃত পণ্ডিত বৃহস্পতি সুলতান জালালউদ্দীন মুহম্মদ শাহের কাছ থেকে সাতবার উপাধি পেয়েছিলেন—আচার্য, কবিচক্রবর্তী, পণ্ডিত-সার্বভৌম, কবি পণ্ডিতচূড়ামণি, মহাচার্য, রাজপণ্ডিত এবং রায়মুকুটমণি। শেষবারের বেলায় উপাধি ছাড়া তিনি হীরামাণিক্যখচিত হার, কুণ্ডল, রতনচুর আংটি (দশটি), দুটি ছাতা ও অনেক ঘোড়া উপহার স্বরূপ লাভ করেছিলেন।[৫] বৃহস্পতি একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন ও সংস্কৃতগ্রন্থের টীকা লেখেন। 'স্মৃতিরত্নাহার', 'অমরচন্দ্রিকা',

৫. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (অষ্টম সংস্করণ)—ডঃ সুকুমার সেন, পৃঃ ৫৬

'নির্ণয়বৃহস্পতি' প্রভৃতি তাঁহার মৌলিক ও টীকাগ্রন্থ। একই সংস্কৃত কবিকে একাধিকবার সম্মানিত করার দৃষ্টান্তে অনুমিত হয় উক্ত ভাষার প্রতি সুলতানের আগ্রহ ছিল এবং এমনও হতে পারে, তিনি সে ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। সংস্কৃত জানা মুসলমান সুলতান কে হতে পারেন, জালালউদ্দীন ছাড়া। গণেশের পুত্র হিসেবে সংস্কৃত শেখা খুবই স্বাভাবিক। যদি তা'ই হয়, তবে জালালউদ্দীন জানতেন সংস্কৃতের কোন গ্রন্থখানি সারা বাঙালীর হৃদয়মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের চেয়ে রামায়ণের প্রভাব সর্বাধিক ছিল বলে সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন। সুতরাং কৃত্তিবাসের মত একজন পণ্ডিত এবং প্রতিভাধর কবির পরিচয় পেয়ে রামায়ণ রচনা করতে 'অনুরোধ' জানাবেন তা সংগত। একখানি জনপ্রিয় গ্রন্থের স্বদেশী ভাষায় কাব্য রচনায় নির্দেশ দিয়ে এক দিকে যেমন সমস্ত দেশটিকে উপলব্ধি করার প্রমাণ দিয়েছেন, অন্যধারে দীর্ঘদিনের একটা স্থবির ও অচলায়তন সাংস্কৃতিক মনের মুক্তিসাধনের মহৎ নজির স্থাপন করেছেন। সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের দৃষ্টান্ত অনুসরণে তিনি আরবী-ফারসী গ্রন্থের অনুবাদে অনুপ্রাণিত করতে পারতেন, কিন্তু সংস্কৃত পণ্ডিতকে দিয়ে তাতো সম্ভব নয়। জালালউদ্দীন দেশীয় ভাষার চর্চায় সংস্কৃত গ্রন্থাদির ভাষান্তরকরণের এবং যোগ্য ব্যক্তির পুরস্কার দানের যে রীতি প্রতিষ্ঠিত করলেন, পরবর্তী সুলতানগণ মোটামুটি সে পথই অনুসরণ করেছিলেন।

সুলতান জালালউদ্দীন পূর্বসংস্কারবশতঃ হিন্দু আচরণে অভ্যস্ত ছিলেন। কৃত্তিবাস তাঁর রাজসভায় 'নাট্যগীত' হতে দেখেছেন ও শুনেছেন। সুলতান কবিকে 'পুষ্পমাল্য' উপহার দিয়েছিলেন। নাট্যগীত ইসলাম নীতিবিরোধী। আমাদের মনে হয়, মুসলমান আমীর ওমরাহ্‌রা এ জন্যই সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। কৃত্তিবাস

কেবল হিন্দু অমাত্যদের দেখেছেন। এমনও হতে পারে, তখনও প্রকৃত দরবার বসেনি। 'সপ্তঘটি বেলা যখন দেয়ালে পড়ে কাঠি।' উক্তি থেকে কেউ মনে করেন, তখন মূল সভাভঙ্গ হয়েছিল। 'দেয়ালের' পাঠান্তর 'দগড়' ধরলে সকাল বেলা বুঝায়। মাঘমাসে 'খরা-পোয়া' সকাল-বিকেল উভয় সময়ে সম্ভব। 'নাট্যগীতের' অনুষ্ঠানদৃষ্টে মনে হয়, সভাভঙ্গকাল।

রাজ-আদেশে বাংলা রাময়ণ রচনা করলেও কৃত্তিবাসের কাব্যে রাজকীয় জীবনের ছায়াপাত ঘটেনি। কাব্যখানি মূল সংস্কৃতের আক্ষরিক অনুবাদ নয়, ভাবানুবাদ। কৃত্তিবাস কাহিনী, ঘটনা ও চরিত্র সৃষ্টিতে স্বাধীনতা গ্রহণ করে বাঙালীর জীবনবোধের বহু উপকরণ সন্নিবেশ করেছেন—সে সব উপকরণ সর্বসাধারণের জীবননিঃসৃত গভীররসাশ্রয়ী। এ জীবনের সহিত কৃত্তিবাসের আত্মিক পরিচয়।

কৃত্তিবাস অনুগ্রাহক সুলতানের কাছ থেকে 'উপাধি' পাননি এজন্য যে, কাব্যসমাপ্তির আগেই তাঁর জীবনাবসান হয়। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে লিখেছেন, "আমরা একখানি প্রাচীন কৃত্তিবাসী রামায়ণে কৃত্তিবাসকে 'কবিত্ব ভূষণ' উপাধি বিশিষ্ট দেখিয়াছি। এই 'কবিত্ব ভূষণ' রাজদত্ত উপাধি অথবা পুঁথি লেখকের প্রশংসাপত্র, স্থির করিতে পারিলাম না।"[৬] সুলতান কর্তৃক উক্ত উপাধি দান অসম্ভব নয়, তবে প্রথম বার সাক্ষাতে কৃত্তিবাস এ উপাধি পাননি; পেলে তাঁর কাব্যে উল্লেখ করতেন। এ সম্পর্কে নতুন তথ্য না পাওয়া পর্যন্ত জোর করে কিছু বলা যায় না।

---

৬. (পৃঃ ৯৯)

সুলতান শামসউদ্দীন আহমদ শাহ

(১৪৩২—৪২ খ্রীঃ)

চণ্ডীদাস ॥ বৈষ্ণবপদ (?)

গৌড় সুলতান শামস্‌উদ্দীন আহমদ শাহ কোন এক চণ্ডীদাসের 'পৃষ্ঠপোষক' ছিলেন না, বরং 'পৃষ্ঠনাশক' ছিলেন। চণ্ডীদাসপ্রিয়া রামীর পদের ব্যাখ্যানুযায়ী সুলতানের আদেশে চণ্ডীদাসের 'পৃষ্ঠ-দেশ' বিদীর্ণ ক'রে বধ করা হয়েছিল। ব্যাপারটি অতিশয় নির্মম এবং বর্তমান আলোচনার প্রসঙ্গ বিরোধী মনে হলেও উল্লেখ করছি এজন্য যে, চণ্ডীদাসের বধাজ্ঞা একটা ঘটনার ব্যথিত পরিণতি, উপলক্ষটি কিন্তু ভিন্ন ছিল। আমরা চণ্ডীদাসের জীবনান্তের উক্ত তথ্যটির সত্যাসত্যের বিচার না করে, তিনি যে গৌড়েশ্বরের দরবারে গিয়েছিলেন এবং যে উপলক্ষে গিয়েছিলেন এখানে তা আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা মনে করি।

চণ্ডীদাসের মৃত্যু সংক্রান্ত একটি পদের (রামী রচিত) ব্যাখ্যা করে ডঃ শহীদুল্লাহ লিখেছেন, "চণ্ডীদাস রাজা গৌড়েশ্বরের দরবারে রাণীর সহিত গান করিতে গিয়াছিলেন। গান শুনিয়া বাদশাহের বেগম তাঁহার প্রতি অনুরাগিণী হন এবং রাজাকে মনের কথা বলিয়া ফেলেন। ইহাতে রাজা রাণী ও চণ্ডীদাসকে বধদণ্ড দান করেন। দণ্ডটি ছিল অদ্ভুত রকমের। তাঁহাকে হাতীর পিঠে অধোমুখে বাঁধিয়া শিকারী বাজপাখী ছাড়িয়া দেওয়া হয়।" [১]

---

১. বাংলা সাহিত্যের কথা (মধ্যযুগ) পঃ ৫৪

রামীর বিভিন্ন পদে রাজার উল্লেখ ও পরিচয় জ্ঞাপক নিম্নের চরণ ক'টি স্মরণীয় :

"কি করিল রাজা গৌড়েশ্বর।
না জানিঞা প্রেম লেহ ব্রেথাই ধরিস দেহ
বধ কৈলে প্রাণের দোসর ॥"

"রাজা গৌড়েশ্বর দুষ্ট কলেবর
কেহ না বুঝাল তাকে।
নাথ আমি সে রজক বালা।
আমার বচন না স্তুনে রাজন
বুঝিল কৃষ্ণের লীলা।'*

'রাজা হে জবন জাতি।
কি জানে রসের গতি।'

রামীর গৌড়েশ্বর 'যবন' বা মুসলমান, কিন্তু তাঁর নাম কি তা উল্লিখিত হয়নি। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় গণেশ পুত্র যদু বা জালালউদ্দীনের নাম করেছেন। লিখেছেন, "তিনি স্বধর্ম ত্যাগী ও স্বজাতিদ্রোহী। বিশেষ তাঁহার অন্দর মহলে অনেক হিন্দু বেগম ছিলেন, তাঁহারা যদিও বা স্বামীর সঙ্গে ধর্ম ত্যাগ করিয়া থাকেন, রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক সংগীতের অনুরাগিণী হওয়া তাঁহাদের মধ্যে কোন একটিরই হওয়া স্বাভাবিক। অন্ততঃ খাঁটি মুসলমান রমণী হইতে তাঁহাদেরই হিন্দু গানের সমজদার হওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা। জালালউদ্দীনের রাজত্ব কালও চণ্ডীদাসের সমসাময়িক।" [২]

---

২. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (৮ম সং), পৃঃ ১৪০

* রামীর উক্ত পদটি ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য' (অষ্টম সংস্করণ) গ্রন্থে ১৩৮-৪০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হয়েছে ; উৎসাহী পাঠক-পাঠিকা তা অনুসন্ধান করতে পারেন। উদ্ধৃতি বাহুল্য ও প্রসঙ্গচ্যুতির জন্য আমরা কেবল প্রয়োজনীয় অংশ উল্লেখ করেছি।

চণ্ডীদাসের কালজ্ঞাপক একটি পদের ব্যাখ্যায় ডঃ শহীদুল্লাহ সাহেব ১৪৩৩ খ্রীষ্টাব্দ অনুমান করেছেন।[৩] তখন গৌড়ের সিংহাসনে শামস্উদ্দীন আহমদ শাহ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচয়িতা চণ্ডীদাস সুলতান সেকান্দর শাহের (১৩৫৭-৯৩ খ্রীঃ) অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন। কমপক্ষে ৪০ বছর পরে একই চণ্ডীদাস গান করতে আহূত হয়েছিলেন এবং তাঁর কণ্ঠস্বরের সুমিষ্টতায় হেরেমমহিষী প্রেমাসক্তা হয়েছিলেন তা অভব্য। কবি তখন বৃদ্ধ। এজন্য অনেকে মনে করেন, সুলতান শামস্-উদ্দীনের রাজসভায় গান করতে যিনি আহূত হয়েছিলেন তিনি পদকর্তা চণ্ডীদাস। তিনি একাধারে গায়ক এবং পদকারও। কিংবদন্তী অনুসারে, রামীর সান্নিধ্য ও মর্ত্য-প্রেমই চণ্ডীদাসের অধ্যাত্ম প্রেমের মূল উৎস। মর্ত্য প্রেম এবং স্বর্গীয় প্রেম তথা মানব প্রেম ও ঈশ্বর প্রেম চণ্ডীদাসের সুললিত কণ্ঠে শত ধারায় উচ্ছ্বসিত ও ঝংকৃত হয়েছে। তাঁর গীতি-প্রসিদ্ধি রাজদরবারেও পৌঁছেছিল। যাঁর কণ্ঠসংগীত নবাব-পত্নীকে অন্তঃপুর থেকে টেনে এনে রাজৈশ্বর্যের সমস্ত অহংকারকে পল্লীর পথের ধূলোয় মিশিয়ে দিয়েছিল[৪] তাঁর প্রভাব

---

৩. বাংলা সাহিত্যের কথা, পৃঃ ৫২

পদটি নিম্নরূপ ঃ

'বিধুর নিকটে বসি নেত্র পঞ্চবান।
নবহুঁ নবহুঁ রস গীত পরিমাণ॥
পরিচয় সঙ্কেত অঙ্কে লিয্যা।
আদি বিধেয় রস চণ্ডীদাস কিয্যা॥'

৪. ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন বীরভূমে প্রচলিত একটি প্রবাদের ভিত্তিতে বলেছেন, স্থানীয় পরগণার নবাববেগম চণ্ডীদাসের প্রেমাত্মকগানে মুগ্ধ ও বিমোহিত হয়ে রাজপ্রাসাদ ছেড়ে ছদ্মবেশে পল্লীতে পল্লীতে গিয়ে কবির গান শুনতেন। পৃঃ ১৩৬-৭, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।

এদেশের জীবনরক্তে এক হয়ে মিশে আছে। অন্তঃপুর-বদ্ধা বাঙালী রমণীর মনোরঞ্জন নিমিত্ত বাংলা কাব্যসংগীত রাজদরবারের অনুগ্রহ ও সমর্থন লাভ করেছিল, উক্ত ঘটনাটি তারই ইংগিত বহন করে। বাস্তবিক চণ্ডীদাসের পূর্বরাগের গানগুলি ('সই, কেবা শুনাইল শ্যামনাম', 'এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা' প্রভৃতি) কার না হৃদয়ে অনুরাগের সঞ্চার করে! রামীর কবিতায় একাধিক স্থানে চণ্ডীদাসের গানের সুমিষ্টতার কথাই বলা হয়েছে—যেমন,

"চঞ্চল স্বভাব তোর চিত
সভাতে গাইলে গীত
মনের মরম করি সার।"

"কেন বা সভাতে কৈলে গান।
স্বর্গ-মঞ্চ পাতালপুর আবির্ভূত পশু নর
মানিনীর না রহিল মান॥'

"জাহার সুস্বর গানে।
বিন্ধিল আমার প্রাণে॥"

সুতরাং 'গৌড়েশ্বরে'র আমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসে গৌড়রমণীর হৃদয় হরণ করবেন—এটা খুবই স্বাভাবিক। শুধু স্বাভাবিক ছিল না সুলতানের বধাজ্ঞার নির্মমতা। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় যে কারণে উক্ত গৌড়েশ্বরকে সুলতান জালালউদ্দীন মুহম্মদ শাহ মনে করেন, ঠিক অনুরূপ কারণে সুলতান শামস্উদ্দীন আহমদ শাহ 'গৌড়েশ্বর' হতে পারেন। কারণ গণেশের পৌত্র হিসেবে তাঁর রাজঅন্তঃপুরে হিন্দুরমণীর অবস্থান করা মোটেই অসম্ভব ছিল না। সুলতান জালালউদ্দীন কিছুটা হিন্দু নির্যাতন করেছেন বটে, কিন্তু গুণীর নির্যাতন

করেননি। কৃত্তিবাস যেখানে বলেছেন, 'গৌড়েশ্বর পূজা কৈলে গুণের হয় পূজা।' রামী সেখানে 'রাজা গৌড়েশ্বর তুষ্ট কলেবর' বলতেন না। যিনি বৃহস্পতি মিশ্র ও কৃত্তিবাসকে উপাধি ও পুরস্কারে ভূষিত করে কাব্যসাহিত্যচর্চায় উৎসাহিত করেছেন তিনি ব্যক্তিগত কারণে একজন সংগীতসাধকের প্রতি এমন নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিতেন না। বিশেষতঃ যেখানে,

"পার্চ্ছার বেগম কয়।
সুন মহিনাথ মহাশয়॥
তুমি অবলার বচন রাখ।
রসিক মণ্ডল দেখ॥"

এবং যেখানে,

"জোড় করে কহে রামী।
সুন নৃপ চূড়ামণি।
সুন রসের স্বরূপ সে॥
কেন বিনাস করহ তাহার দে।
সে সামান্য মানুষ নহে।
রতি স্থিতি তার দেহে।
… …
কেন কৈলে এমন কাজ।
ভুবনে রাখিলে লাজ।"

সেখানে সুলতান লঘুশাস্তির ব্যবস্থা করতেন। প্রকৃত অপরাধ বেগমের, চণ্ডীদাসের নয়। এদিকে সুলতান আহমদ শাহ দুর্নীতিপরায়ণ ও অকর্মণ্য ছিলেন। 'রিয়াজ-উস-সলাতীন' গ্রন্থ হতে উদ্ধৃতি সংগ্রহ করে শ্রীসুখময়বাবু লিখেছেন, "তিনি (শামসুদ্দীন) অত্যন্ত বদমেজাজী, অত্যাচারী এবং রক্তপিপাসু ছিলেন। বিনা কারণে তিনি রক্তপাত করতেন…। অত্যাচার যখন চরমসীমায় পৌঁছালো এবং উচ্চনীচ-নির্বিশেষে সকলেই যখন তাঁর নৃশংসতায় শোচনীয়ভাবে পীড়িত হতে

লাগল, তখন সাদি খাঁ এবং নাসির খাঁ নামে তাঁর দুই ক্রীতদাস, যারা অমাত্যপদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন, ষড়যন্ত্র করে আহমদ শাহকে হত্যা করেন।"[৫] ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন সলিম সাহেবের এই উক্তি কতখানি সত্য জানি না, কারণ প্রকৃত আমলের প্রায় সাড়ে তিনশ' বছর পর গ্রন্থখানি রচিত হয় (১৭৮৮ খ্রীঃ)। 'তারিখ-ই-হিন্দ্' গ্রন্থে (আকবরের আমলে রচিত) ঐতিহাসিক আবুল কাসিম ফিরিস্তা সুলতান আহমদ শাহকে সদাচারী বলেছেন। ফিরিস্তা দাক্ষিণাত্যে বসে এ পুস্তক লিখেছেন, গোলাম হোসেন সলিম বাংলা দেশে থেকে লিখেছেন। যদি সলিম সাহেবের মত সত্য হয়, তবে সুলতান চণ্ডীদাসকে লঘুপাপে গুরুদণ্ড দিয়েছিলেন, ধরে নিতে পারি এবং তা তাঁর স্বভাবানুযায়ী হয়েছিল।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের' চণ্ডীদাসের সহিত গায়ক চণ্ডীদাস যদি অভিন্ন ব্যক্তি হন তবে সুলতানের বিরূপ আচরণ গ্রন্থখানির প্রচারের অন্তরায় হয়েছিল। পাছে রাজরোষ খড়্গহস্ত হয়ে ওঠে সেজন্য লোকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন চর্চা পরিত্যাগ করে। বাংলার পুঁথি-আশ্রিত প্রাচীন গ্রন্থগুলির মধ্যে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকীর্তনই অধিক লিপিকরণ ও রূপান্তর গ্রহণের সুযোগ হারিয়েছে। পদগুলি বাঁধন-ছাড়া, লোকমুখে এগুলির স্বরলহরী রোধ করে কে? কেবল আখ্যানধর্মী শ্রীকৃষ্ণকীর্তন হয়ত সুলতানের কোপানল হতে আত্মরক্ষায় এক অজ্ঞাতপল্লীর গোয়ালঘরের নিভৃত কোণে মুখ থুবড়ে পড়েছিল। অশ্লীল কাব্য হিসেবে গ্রন্থখানির নির্বাসন একেবারে অকল্পনীয় নয়।

এটা অনুমান মাত্র, প্রামাণিক নয়। অনুমান যদি সত্যবাচী হয়, তবে বাংলা সাহিত্যের বিকাশে সুলতানদের সহযোগিতার অপরিহার্যতা অনুভব করা যায়। সুলতান আহমদ শাহের মত যদি অন্যান্য

---

৫. বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর—পৃঃ ৭৭

সুলতানের রাজরোষ দেখা যেত তবে বাংলা সাহিত্যের প্রকাশ্যচর্চা থাকত না।

আমরা আগেই বলেছি, যৌনরুচি নিয়ে একটি প্রেমময় অবস্থার সহিত জড়িয়ে পড়ে কবি ও কাব্যের দণ্ড একটা দুর্ঘটনা, সুস্থপরিবেশ ও পরিণতি সুখদায়ক হলে সুলতান কর্তৃক কবি পুরস্কৃত হতেন, তিরস্কৃত হতেন না।

সুলতান রুকন্‌উদ্দীন বারবক শাহ

(১৪৫৯—৭৪ খ্রীঃ)

মালাধর বসু ॥ শ্রীকৃষ্ণবিজয়

১৪৪২ খ্রীষ্টাব্দে ইলিয়াসশাহী বংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়। দেশে শান্তি ফিরে আসে। জনসাধারণ সুখে ও সমৃদ্ধিতে বসবাসের সুযোগ লাভ করে। প্রথম পর্বে (১৩৪২-১৪১৪ খ্রীঃ) ইলিয়াস শাহ, সিকান্দর শাহ, ও গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ যেমন, দ্বিতীয় পর্বে (১৪৪২-১৪৮৭খ্রীঃ) নাসিরউদ্দীন মাহমুদ শাহ, রুকনউদ্দীন বারবক শাহ ও সাম্‌সউদ্দীন ইউসুফ শাহ তেমনি দৃঢ়তা ও দক্ষতার সহিত শান্তি ও সমৃদ্ধির মধ্যে রাজত্ব করেছেন। নানা লোকহিত কর্ম, স্বধর্ম বিস্তার ও সাহিত্যসংস্কৃতির উন্নতির জন্য তাঁরা প্রত্যেকেই বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে গেছেন। সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁরা কখনো সংকীর্ণতার পরিচয় দেননি। রাজভাষা ফারসী, মাতৃজবান তুর্কি, স্বধর্মের ভাষা আরবী, এদেশীয় জনসাধারণের মুখের ভাষা বাংলা, হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের ভাষা সংস্কৃত। গৌড়ের সুলতানগণ যে কোন ভাষাতে শাস্ত্র ও সাহিত্যচর্চাতে সমান উৎসাহ জ্ঞাপন করেছেন। বাংলা ভাষা চর্চার গুরুত্ব ছিল বেশী এইজন্য যে, রাজ্যশাসনে জনসাধারণের নিবিড়তা লাভের সুযোগ এ ভাষার মাধ্যমে সম্ভব ছিল। বাঙালী কবি-শিল্পিগণ যুগে যুগে সুলতানদের অনুগ্রহ ও অনুপ্রেরণা লাভ করলেন, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ধাপে ধাপে বিস্তৃতি ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলল।

গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ মুহম্মদ সগীরকে অনুগ্রহ দান করেছেন, জালালউদ্দীন কৃত্তিবাসকে সম্বর্ধনা জানিয়েছেন, কিন্তু রুকন্উদ্দীন বারবক শাহ মালাধর বসুকে একেবারে 'উপাধি'তে ভূষিত করেছেন। বাংলা ভাষার অন্য কবি এর আগে উপাধি পাননি।

বর্ধমান জেলার কুলীন গ্রামবাসী মালাধর বসু 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' গ্রন্থের রচয়িতা। গ্রন্থখানি মৌলিক নয়, ভাগবতের অনুবাদ। অংশবিশেষ সংস্কৃত গ্রন্থের আক্ষরিক অনুবাদ, অংশবিশেষ ভাবানুসরণ। কবি ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধের কাহিনী অবলম্বনে কাব্যরচনা করতে গিয়ে কৃষ্ণবিষয়ক অন্যান্য গ্রন্থ (বিষ্ণুপুরাণ ও হরিবংশ) এবং প্রচলিত লোককাহিনীরও সাহায্য গ্রহণ করেছেন। সুতরাং অংশবিশেষে কবি মৌলিকতাও প্রদর্শন করেছেন।

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের কাব্যমূল্য বিচার করতে গিয়ে সমালোচক বলেছেন, "এই কাব্যের বৃন্দাবনলীলায় কিছু কিছু আদিরস থাকিলেও কাব্যটিকে বীররসাত্মক মহাকাব্য শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিতে পারা যায়। বৃন্দাবন, মথুরা ও দ্বারকালীলায় কৃষ্ণের ঐশ্বর্যবীরত্বের দিকটি অধিকতর ফুটিয়াছে।"[১] তিনি অন্যত্র লিখেছেন, "ভাগবত অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণবিজয়েই কৃষ্ণের প্রতাপের রূপটি অধিকতর প্রাধান্য পাইয়াছে ; রাস, গোপীলীলা প্রভৃতি আদিরসাশ্রিত বর্ণনাকে মালাধর অনেকটা সঙ্কুচিত আকারে বর্ণনা করিয়াছেন।"

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের কাহিনী পরিকল্পনা ও রসবর্ণনায় যে ঐশ্বর্যভাবের প্রকাশ ঘটেছে তাতে তাঁর পৃষ্ঠপোষক ও উপাধিদাতা গৌড়েশ্বরের রাজকীয়তার অনুকূল পরিবেশ রচনার একটা প্রচ্ছন্ন ইংগিত থাকা একেবারে অযৌক্তিক নয়। শ্রীকৃষ্ণের বীর্যবানতায় তৎকালীন হিন্দুর

---

১. পৃঃ ৫৯৭, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (১ম খণ্ড)—ডঃ অতিসকুমার বন্দ্যোপধ্যায়
২. পৃঃ ৬০৮, ঐ

জাতীয় মানসিকতার মুক্তির আস্বাদলাভের চেষ্টা নিহিত আছে বলে অনেকে মনে করেন ; কিন্তু সে যুগের নির্জীব সমাজ চৈতন্যের প্রেক্ষাপটে এরূপ ধারণা ভ্রমাত্মক। সে যুগে রাজা-বাদশাহ মাত্রই এক একজন বীর সৈনিক ; কথায় কথায় অসির ঝংকার, তরবারির খেলা। যার যত বাহুবল এবং অসি-কৌশল, জয়ের রাজটীকা তারই ললাটে শোভা পেত। 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা' কথাটি তখন সুপ্রযোজ্য ছিল।

যুদ্ধের খেলায় বাংলার পাঠান সুলতানরা বরাবর বেপরোয়া ছিলেন। বারবক শাহের আমলও যুদ্ধহীন ছিল না ; তিনি যুদ্ধ করেছেন উড়িষ্যার রাজা গজপতির বিরুদ্ধে, যুদ্ধ করেছেন কামরূপের রাজা কামেশ্বরের বিরুদ্ধে, আর চট্টগ্রামে মগরাজার বিরুদ্ধে।[৩] সুতরাং যুদ্ধের কাহিনী তিনি ভালবাসতেন। মালাধর বসুর তা অপরিজ্ঞাত ছিল না। তাই তিনি কৃষ্ণের মথুরালীলা ও দ্বারকালীলার কথা বিস্তৃতভাবে বললেন— যেখানে অত্যাচারী কংসকে বধ করা হয়েছে আর যেখানে যদু বংশের ধ্বংসপর্ব বর্ণনা করা হয়েছে। বিশেষতঃ পণ্ডিতগণ যখন মনে করেন, 'রাজকার্যাবসানে মুসলমান সম্রাটগণ পাত্রমিত্র পরিবেষ্টিত হইয়া হিন্দু শাস্ত্রের বঙ্গানুবাদ শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেন'[৪] এজন্য যে, রামায়ণ-পুরাণাদির প্রভাব তাঁরা জনজীবনে লক্ষ্য করেছিলেন, তখন বিশেষ অর্থে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনী বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে গৌড়েশ্বরের সন্তোষবিধানের চেষ্টা করা হয়েছে তা অনেকখানি সহজ ও যথার্থ অনুমান।

'আত্মপরিচয়' অংশে মালাধর বসু লিখেছেন,

"গুন নাহি অধম মুঞি নাহি কোন জ্ঞান।
গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজ খান॥

---

৩. History of Bengal. vol. II, (Ed) Sir Jdunath Sarker, Dacca University, 1948, P. 133—'35.

৪. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য : ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন, পৃঃ ৭৪

সত্যরাজ খান হয় হৃদয় নন্দন।
তারে আশীর্বাদ কর যত সাধুজন॥
... ...
কায়স্থকুলেতে জন্ম কুলীন গ্রামে বাস।
স্বপ্নে আদেশ দিলেন প্রভু ব্যাস॥
তাঁর আজ্ঞামতে গ্রন্থ করিনু রচন।
বদন ভরিয়ে হরি বল সর্ব্বজন॥"

কবি স্পষ্টতঃ স্বীকার করেছেন, 'গৌড়েশ্বর' তাঁকে 'গুণরাজখান' নাম বা উপাধি দিয়েছিলেন। কিন্তু কোন গৌড়েশ্বর কেন তাঁকে উপাধি দিলেন তা বলেননি। মালাধর তাঁর পৃষ্ঠপোষক সুলতানের নাম না করলেও কবির পুস্তক রচনাকাল আজ আর রহস্যাচ্ছন্ন নয়। বিশেষতঃ তাঁর কালজ্ঞাপক দুটি চরণ সংশয় নিরসনে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছে। চরণ দুটি নিম্নরূপ ঃ

"তের শ পঁচানব্বই শকে গ্রন্থ আরম্ভন।
চতুর্দ্দশ দুই শকে হৈলা সমাপন॥"

সংখ্যায় লিখলে বলা যায়, কবি ১৩৯৫ শকাব্দে কাব্যরচনা শুরু করেন, এবং ১৪০২ শকাব্দে তা সমাপ্ত করেন। ইংরেজী খ্রীষ্টাব্দে ১৪৭৩—'৮১ সাল।

১৪৭৪ সাল পর্যন্ত রুকনউদ্দীন বারবক শাহের রাজত্বকাল নির্ণীত হয়েছে। কবি কাব্যের সূচনা থেকেই বিভিন্ন স্থানে 'গুণরাজখান' উপাধি ভনিতায় ব্যবহার করেছেন। এতে পণ্ডিতগণ মনে করেন, মালাধর আগে অথবা গ্রন্থ রচনার শুরুতে উপাধি পেয়েছিলেন। এরূপ ধারণা সত্য হলে সুলতান বারবক শাহ ছিলেন কবির পৃষ্ঠপোষক। কবি স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে কাব্যরচনায় মনোনিবেশ করেন। সুলতানের আদেশ-নির্দেশের উল্লেখ করেন নি। তাঁর কাব্যরচনার মৌল উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণের কাছে ভাগবতের বাণী পৌঁছিয়ে

দেওয়া।[৫] সুতরাং এ গ্রন্থখানির জন্য সুলতান কবিকে পুরস্কৃত করেননি। 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' রচনার আগে থেকেই তাঁর কবিখ্যাতি ছিল। প্রমাণ নেই, হয়ত কালের গর্ভে লুপ্ত হয়ে গেছে। এরূপ অনুমানের ভিত্তিতে সুলতান বারবক শাহ কর্তৃক অনুগৃহীত হওয়া স্বাভাবিক।

অনেকে কালজ্ঞাপক শ্লোকটির প্রামাণিকতা ও মৌলিকতা স্বীকার করেন না। কেদারনাথ দত্ত সম্পাদিত এবং 'বটতলা' থেকে প্রকাশিত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' গ্রন্থেই কেবল উক্ত শ্লোকটি পাওয়া যায়, অন্যত্র পাওয়া যায় না। তিনি প্রাচীন পুঁথিতে শ্লোকটি পেয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কেদারনাথ দত্ত সম্পাদিত গ্রন্থখানির আদ্যন্ত পাঠ বিশ্লেষণ করে পুঁথি-আশ্রয়িতা ও সম্পাদককৃত সংশোধনের তুলনামূলক বিচারে গ্রন্থের নির্ভরযোগ্যতা তথা শ্লোকটির অভ্রান্ততা স্বীকারে সংশয় প্রকাশ করেছেন।[৬]

সুলতান রুকনউদ্দীন বারবক শাহ যদি কবির পৃষ্ঠপোষক না হন তবে, সুলতান শামসউদ্দীন ইউসুফ শাহ হতে বাধা নেই। তিনি ১৪৭৪ থেকে ১৪৮১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ইউসুফ শাহ গুণগ্রাহী ও বিদ্যোৎসাহী সুলতান ছিলেন। তিনি কবি জৈনুদ্দীনকে উৎসাহ দান করেছিলেন। কবি মালাধর বসু তাঁর অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হবেন, এমন হতে পারে না। তাঁর রাজত্বকাল বরাবর কাব্যের রচনাকাল প্রবাহিত। এর মধ্যে কোন এক সময় উপাধি পেয়ে ভনিতায় তার প্রয়োগ করেছেন।

---

৫. কবির উক্তি :

'ভাগবত শুনিল আমি পণ্ডিতের মুখে।
লৌকিকে কহিয়ে সার বুঝ মহাসুখে॥
ভাগবত অর্থ যত পয়ারে বান্ধিয়া।
লোক নিস্তারিতে যাই পাঁচালী রচিয়া॥'

৬. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (প্রথম খণ্ড), পৃঃ ৫৯০—৯৪

মালাধর বসু তাঁর সন্তান 'সত্যরাজখানে'র জন্য সুধীজনের আশীর্বাদ কামনা করেছেন। 'সত্যরাজখান' নাম নয়, উপাধি। হয়ত সুলতান বারবক শাহের কাছ থেকেই তা লাভ করেন। সত্যরাজখান সম্ভবত সুলতানের সভাসদ ছিলেন। কোন সৎ কাজ করার জন্য কিংবা সত্য পথে চলার জন্য পুত্র যদি 'সত্যরাজখান' খেতাব পান, তবে কাব্যগুণের জন্য পিতা 'গুণরাজখান' খেতাব পাবেন তা স্বাভাবিক। উভয়ের মধ্যে সময়ের পার্থক্য হয়ত ছিল না। কারণ নিজের খেতাবের পরের চরণে সত্যরাজের উল্লেখ করেছেন। পুত্রের আগে পিতা সম্মানিত হতে পারেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কুলধর নামে একজন সুবর্ণ বণিকও সুলতান বারবক শাহের কাছ থেকে 'শুভরাজখান' উপাধি পেয়েছিলেন। ১৪৭৩-৭৪ খ্রীষ্টাব্দে সংকলিত 'পুরাণ সর্বস্ব' গ্রন্থে এ সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায়।[৭] কোন শুভকাজ করার জন্য 'গৌড়েশ্বর' তাঁকে এ উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।

সুলতান বারবক শাহ গুণের সমাদর করতেন। তিনি নিজেও ছিলেন জ্ঞানী ও সুশিক্ষিত। ফারসী কোষগ্রন্থ 'শরফনামার' রচয়িতা ইব্রাহিম কাইয়ুম ফারুখি সাহেব সুলতানের প্রশস্তি গেয়ে বলেছেন—

"বুল মুজাফ্‌ফর বারবকশাহ শাহ আলম বাদৃশ্‌ত।
দরন্‌গীন্ উ হামিশাহ মুলকাতে জম্‌ বাদৃশ্‌ত্‌॥" [৮]

ডঃ আবদুল করিম সাহেব এর ইংরেজী তরজমা করেছেন, "May Abul Muzaffar Barbak Shah be Shah-i-Alam (king of the world) and he is. May the kingdom of Jamshid be under him and it is." [৯]

---

৭. শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়; বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর, পৃঃ ১০৯—১০

৮. ডঃ আবদুল করিম সাহেব কৃত "The Social History of the Muslims in Bengal" গ্রন্থের উদ্ধৃতি থেকে সংকলিত। পৃঃ ৭৮

৯. ঐ, পৃঃ ৭৮

পেন্‌সিলভিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত সুলতান বারবক শাহের নামাঙ্কিত শিলালিপিতে আরবী কবিতায় সুলতানের চরিত্র এবং তাঁর রাজপ্রাসাদের সুরম্যতার বর্ণনা করা হয়েছে বলে শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। সুলতানের প্রশস্তিবাচক কবিতাটির তিনি নিম্নরূপ বাংলা তর্জমা করেছেন—

"শাহ সুলতান রুক্‌ন্ অল-দুনিয়া ওয়ালদীন
আমাদের সুলতান বারবকশাহ জ্ঞানী এবং মহিয়ান।
......বিধাতার সমগ্র রাজ্যে আর কেউই নেই
যিনি মহত্ত্বে তাঁর সমান। তাঁর সময়ে তিনি
ছিলেন অদ্বিতীয় এবং অতুলনীয়।" [১০]

ফারুখি লিখেছেন, সুলতানের ক্ষুদ্রতম দান ছিল একটি ঘোড়া। তিনি পদচারীকে সহস্রাধিক ঘোড়া উপহার দিতেন। লোকে একটা ঘোড়া চাইলে অনেকগুলি পেত। উক্তিটির অতিরঞ্জন অংশ বাদ দিলেও এতে সুলতানের বদান্যতার পরিচয় ফুটে ওঠে। ফারুখি সুলতানের অধীনস্থ কর্মচারী ছিলেন। তাঁর উল্লিখিত ফারসী কোষগ্রন্থে সমসাময়িক কয়েকজন গুণী জ্ঞানীর নাম করেছেন। এঁদের মধ্যে আমীর জৈনুদ্দিন হারয়ী, মনসুর সিরাজী, মালিক ইউসুফ বিন হামিদ, সৈয়দ জলাল, সৈয়দ মুহম্মদ রুকন্ এবং সৈয়দ হাসান কবি ছিলেন। জৈনুদ্দিনকে 'মালেকুল্ শোয়ারা' বা 'রাজকবি' এবং মনসুর সিরাজীকে ফারসী ভাষার কবি বলে অভিহিত করেছেন। [১১] আমীর জৈনুদ্দিন 'রসুলবিজয়' রচয়িতা কবি জৈনুদ্দিনের সহিত অভিন্ন ব্যক্তি হতে পারেন; কিন্তু কবি তাঁর কাব্যে সর্বত্রই পৃষ্ঠপোষক 'ইছুপ খান' বা

১০. বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর, পৃঃ ১২০

১১. History of the Muslims in Bengal—Dr Abdul Karim, Dccae. 1959, P. –79.

ইউসুফ শাহের নাম করেছেন বলে পরবর্তী অধ্যায়ে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনার আশা রাখি।

কেবল বাংলা নয়, আরবী ফারসী নয়, সংস্কৃত ভাষারও ভক্ত ছিলেন সুলতান বারবক শাহ। তাঁর মুদ্রায় আরবীর সঙ্গে সংস্কৃতেরও ব্যবহার করেছেন।

উপরের আলোচনা থেকে বুঝা যায়, জাতিধর্ম নির্বিশেষে গুণবান ব্যক্তিমাত্রকেই বারবক শাহ উপাধি ও পুরস্কারে সম্মানিত করেছেন। উপাধিগুলির নাম সাদৃশ্য লক্ষণীয়—'গুণরাজ', 'সত্যরাজ', 'শুভরাজ', 'কবিরাজ' (Poet-laureate)। এগুলি একই সুলতান কর্তৃক প্রদত্ত ধরা যায়। সুলতান ইউসুফ শাহ তাঁর আশ্রিত কবি জৈনুদ্দিনকে কোন উপাধি দেননি। সুতরাং মালাধর বসুর পৃষ্ঠপোষক প্রকৃত 'গৌড়েশ্বর' সুলতান রুকন্‌উদ্দীন বারবক শাহ।

কাব্যের বিচারে না হোক, ধর্মীয় দৃষ্টিভংগিতে পরবর্তীকালে শ্রীচৈতন্য 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে'র অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। কাব্যধৃত 'নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ' ছত্রটি শ্রীচৈতন্যের চিত্তহরণ করেছিল।

রুচি-শালীনতা শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের উল্লেখ্য বিষয়। কাহিনীর প্রথমাংশে রাধাকৃষ্ণের লৌকিক প্রেমবর্ণনায় 'গীতগোবিন্দ' ও 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র অনুরূপ আদিরসের চর্চা করতে পারতেন। করেননি, কারণ তাঁর কাব্য পাছে স্বয়ং গৌড়েশ্বর ও রাজ-অমাত্যদের কাছে রুচি-বিগর্হিত বলে মনে হয়। নিছক কাব্যিকতা মালাধর বসুর লক্ষ্য ছিলনা, লক্ষ্য ছিল শ্রীকৃষ্ণের মহিমা প্রচার, সে মহিমা ভক্তের কাছে প্রেম-স্বরূপে নয়, পাঠকের কাছে বীর্যত্বের গৌরবে। গৌড় দরবারের রাজছত্রের ছায়ান্তরালে বসে কবি রাজষিক ঐশ্বর্যকে অস্বীকার করেননি, অস্বীকার করেননি মুসলমান রাজন্যবর্গের রুচি-আদর্শকে। মুসলমানের সমাজনীতির সহিত তুলনায় অপেক্ষাকৃত শিথিল সমাজ ও জীবনরসে

অভিষিক্ত হিন্দু-মানসিকতার এরূপ সংযমবোধ ও রুচি-রূপান্তরের মূল্যায়ন আর কেউ স্বীকার না করলেও, ইতিহাস অস্বীকার করে না। প্রশ্রয় পাওয়া মাত্র নৈতিক শিথিলতার সুপ্তবীজ আবার আত্মপ্রকাশ করতে পারে, আমরা অষ্টাদশ শতাব্দীর নদীয়াধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় কবি ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়েছি। শক্তি-অবসিতপ্রায় নবাবীবিলাসিতা ও আয়াসপ্রিয়তায় সেদিন নীতিবোধেও ঘুণ ধরেছিল। কিন্তু পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের বাঙালীর প্রাণপ্রাচুর্যে জীবনরুচি ও আদর্শের মান অনেক উন্নত ছিল। সে যুগের শিল্প-সংস্কৃতিতে তার চিহ্ন মুদ্রিত। মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের ভেতর দিয়ে তার বিজয়াভিযানের সূচনা।

সুলতান শামসুউদ্দীন ইউসুফ শাহ

জৈনুদ্দিন ॥ রসুলবিজয়

'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে'র অনুকল্পে 'রসুলবিজয়' কাব্যরচনার সম্ভাব্যতা আনুমানিক হলেও, অস্বাভাবিক নয়। রচনা কালের দিক থেকে উভয় গ্রন্থ সমসাময়িক বলে এ সম্পর্কে পাঠকের কৌতূহল আরো বেশি। গৌড়কেন্দ্রে বসে যখন মালাধর বসু 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' লিখছেন, চট্টগ্রাম-কেন্দ্রে বসে তখন জৈনুদ্দিন 'রসুলবিজয়' লিখছেন—এরূপ অনুমান অযৌক্তিক নয়। মালাধরের পৃষ্ঠপোষক 'গৌড়েশ্বর' তথা বারবক শাহ সিংহাসনে ছিলেন, জৈনুদ্দিনের পৃষ্ঠপোষক 'রাজ্যেশ্বর' তথা ইউসুফ শাহ যুবরাজ ছিলেন। ইউসুফ শাহের রাজত্বের শেষ বছর পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের রচনাকাল বিলম্বিত। কিন্তু জৈনুদ্দিন হয়ত ইউসুফ শাহ যুবরাজ থাকাকালীন 'রসুলবিজয়ে'র রচনাকাজ শেষ করেন। এ সূত্র থেকে বলা যায়, 'রসুলবিজয়' 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে'র আগের রচনা।

'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' ছাড়া গ্রন্থের ভনিতায় অন্য একাধিক নাম পাওয়া গেছে—যেমন, 'গোবিন্দবিজয়', 'গোবিন্দমঙ্গল', 'শ্রীকৃষ্ণবিক্রম' প্রভৃতি। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের কাহিনীর ধারা ও রসপরিণতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, কাব্যখানি কৃষ্ণের মৃত্যুতে এবং তাঁর বংশের ধ্বংসের বর্ণনার ভেতর দিয়ে সমাপ্তি লাভ করেছে। 'বিজয়' অর্থে 'মৃত্যু' বা

'মহাপ্রয়াণ' ধরে অনেকে গ্রন্থখানির নামকরণের সার্থকতা অনুসন্ধান করেছেন। কিন্তু এটা দুষ্টকল্পনা। আমাদের মনে হয়, ধর্মকথা ব্যাখ্যার যে প্রতিশ্রুতি ভনিতায় ব্যক্ত করেছেন তার ফলে এবং সামগ্রিকভাবে কাব্যে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা-প্রচার প্রাধান্য লাভ করেছে বলে এর প্রকৃত নামকরণ 'গোবিন্দমঙ্গল' যুক্তিসংগত হয়। 'মঙ্গল' শব্দান্তক কাব্যের নামকরণ মধ্যযুগের ধর্মাশ্রিত আখ্যানকাব্যের সাধারণরীতিতে পরিণত হয়েছিল। মালাধর বসুও স্থানবিশেষে সে নাম গ্রহণ করেছেন। সুতরাং 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়', 'রসুলবিজয়' গ্রন্থের নাম সাদৃশ্যে গৃহীত হয়েছে। রসুল বা হজরত মুহম্মদ (দঃ) এর বিজয় গৌরব বর্ণনায় কবির দৃষ্টি লক্ষীভূত বলে কাব্যখানির নামকরণ সার্থক হয়েছে। কবি ভনিতায় একটি নামই একাধিক স্থানে ব্যবহার করেছেন।[১] যেমন—

"রছুল বিজয়-বাণী সুধারস ধার।"

"রছুল বিজয়-বাণী কৌতুকে শুণন্ত॥"

"রসুল বিজয় বাণী অতি আনন্দিত শুনি
মনে প্রীতি বসিল সভান॥"

পরবর্তীকালে শা'বিরিদ খান হজরত মুহম্মদ (দঃ) এর বিজয়গান করে একই শিরোনামায় 'রসুলবিজয়' কাব্য লিখেছেন, আরো পরে শেখ চাঁদ বিরচিত 'রসুলবিজয়' কাব্য পাওয়া যায়। সৈয়দ সুলতান বিরচিত 'রসুলবিজয়' প্রায় অভিন্ন কাব্য। আমরা অন্তে 'বিজয়' শব্দ যোগে মুসলমান কবি রচিত আরও কয়েকখানি গ্রন্থ পেয়েছি—যথা, 'গাজীবিজয়' (সুলতান বারবক শাহের সমসাময়িক বিখ্যাত ঐতিহাসিক চরিত্র ইসমাইল গাজীপীরের কীর্তিকলাপ বর্ণনায় শেখ ফয়জুল্লাহ

---

১. উদ্ধৃতিগুলি অধ্যাপক আহমদ শরীফ সম্পাদিত 'রসুলবিজয়' কাব্য থেকে সংগৃহীত। বাংলাবিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৬৪) কর্তৃক প্রকাশিত, পৃঃ ২

কর্তৃক রচিত), 'গোরক্ষবিজয়' (শেখ ফয়জুল্লাহ কর্তৃক রচিত) ইত্যাদি। কৃষ্ণের জীবন ও লীলাবিষয়ক অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে, কিন্তু 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে'র শিরোনামার পুনরাবৃত্তি কোথায় নেই। 'শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল', 'গোবিন্দমঙ্গল', 'শ্রীকৃষ্ণযাত্রা', 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ', 'শ্রীকৃষ্ণ-বিলাস', 'গোবিন্দবিলাস', 'গীতগোবিন্দ', 'সঙ্গীতমাধব', 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' প্রভৃতি নাম এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ভাগবতের অনুবাদক কবি শেখর কেবল 'গোপালবিজয়' শিরোনামা ব্যবহার করেছেন। তথাপি দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের বর্ণনাধিক্যে ডঃ শহীদুল্লাহ সাহেবের মতে কাব্যখানি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মত আদিরসাত্মক।[২] অর্থাৎ তিনি গ্রন্থ-নামের সার্থকতা বজায় রাখতে পারেননি।

বাস্তবিক বিজয়ী জাতি হিসেবে ধর্মবীর, রাজনৈতিক যোদ্ধা, প্রভাবশালী পীর-মুর্শেদ তখন মুসলমানদের প্রেরণা যোগাত। পরাভূত ও অনুশাসিত জাতি হিসেবে হিন্দুর সম্মুখে সেরূপ আদর্শ ছিল না। জাতীয়চেতনা তখন জাগেনি বলে ঐতিহ্যলোকে অনুসন্ধান করে সচেতনভাবে বিজয়গাথা রচনার আগ্রহ প্রকাশ করেননি। সুলতান ও রাজ-অমাত্যের আগ্রহাতিশয্যে শ্রীকৃষ্ণের 'বিজয়-গৌরব' বর্ণনা করতে করতে কবি মৃত্যুর বিচ্ছেদাতুরতায় কান্নারোধ করতে পারেননি,—কাব্যের পরিকল্পিত বীররস পরিণতিতে করুণরসে অভিষিক্ত হয়েছে। যুগজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে মালাধর বসুর হয়ত তা পদস্খলন নয়, সত্যানুসন্ধানের এক সুগভীর মর্মোপলব্ধি।

কবি জৈনুদ্দিন তাঁর পৃষ্ঠপোষক সুলতানের নাম করেছেন 'ইছুপখান'। কাব্যের ভণিতায় নানা স্থানে তাঁর গুণগান করেছেন। ডঃ এনামুল হক সাহেব বিরচিত 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থ থেকে প্রয়োজনীয় কয়েকটি উদ্ধৃতি এখানে উল্লেখ করতে পারি:

২. বাংলাসাহিত্যের কথা (মধ্যযুগ) পৃঃ ৪২৯

"দানে ধর্মে হরিশ্চন্দ্র মানে গুরু সম ইন্দ্র
রাজরত্ন মহিমা প্রধান।
শ্রীযুত ইছুপ খান আরতি কারণ জান
বিরচিলু পঞ্চালি সন্ধান॥"

"শ্রীযুত ইছুপ খান রাজেশ্বর গুণবান
সুচরিত সুবুদ্ধি সুঠাম।
রছুলবিজয় বাণী অতি আনন্দিত শুনি
সহপ্রীতি বসিল সভান॥"

"শ্রীযুত ইছুপ খান জ্ঞানে গুণবন্ত।
রছুল-বিজয় বাণী কৌতুকে শুনন্ত॥"

"রছুল-বিজয় বাণী সুধারস ধার।
শুনি গুণিগণ মন আনন্দ অপার॥
সুধীর সুজ্ঞানবন্ত (অতি) সুগায়ক।
শুনি পরিতোষ ভেল ইছুপ নায়ক॥"

কাব্যোদ্ধৃত 'ইছুপ খান' বা 'ইছুপ নায়ক' ইতিহাসের সুলতান ইউসুফ শাহ কিনা সে সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতে পারে। 'যুবরাজ' অর্থে 'নায়ক' শব্দের ব্যবহার প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে অন্যত্র পাওয়া যায় বলে তৎসাদৃশ্যে ডঃ এনামুল হক সাহেব ইছুপ খানকে যুবরাজ ইউসুফ শাহ মনে করেছেন।[৩] সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে গোলযোগ উপস্থিত হয় বলে ইলিয়াসশাহী বংশের দ্বিতীয় পর্বে হয়ত যুবরাজ নির্বাচনের রীতি প্রচলিত হয়েছিল। শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় অনুমান

৩. মুসলিম বাংলা সাহিত্য—পৃঃ ৬২

করে বলেছেন—এই নতুন নিয়মের ফলে সম্ভবত স্থির হয়েছিল, "রাজার পুত্র যুবরাজপদে অভিষিক্ত হবার পর থেকে পিতার সঙ্গে যৌথভাবে রাজত্ব করবেন এবং ঐ সময় থেকেই পিতার মত তাঁরও নামে মুদ্রা, শিলালিপি প্রভৃতি উৎকীর্ণ হবে।"[৪]

সুলতানের সব মুদ্রাই 'খাজানাহ্' বা গৌড়ের টাকশাল থেকে বেরিয়েছে। কেবল একটি মুদ্রা পাওয়া গেছে যার গায়ে 'সোনারগাঁও' এর ছাপ মুদ্রিত।[৫] শ্রীসুখময়বাবুর অনুমানে এবং ইতিহাসের তথ্য প্রমাণে আমরা বলতে পারি, সুলতান তনয় যুবরাজপদে অভিষিক্ত হয়ে সোনারগাঁও-কেন্দ্রিক পূর্ববঙ্গের একটা অংশের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। আর সেই সময়ে চট্টগ্রামের কবি জৈনুদ্দিন তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে কাব্যরচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন। সুলতানের উদ্দেশ্যে কবির উল্লেখিত 'রাজরত্ন' এবং 'রাজেশ্বর' অভিধা দুটি বিশেষ অর্থবাহী বলে মনে হয়। ইউসুফ খান 'রাজ্যেশ্বর', 'গৌড়েশ্বর' নন। তবে 'রাজরত্ন' ভবিষ্যতে 'গৌড়েশ্বর' হবেন। জৈনুদ্দিনের অনুগ্রাহক যুবরাজ 'ইছুপ খান' এবং সুলতান ইউসুফ শাহের অভিন্নতা সম্বন্ধে এর পর আর মতদ্বৈত থাকার কথা নয়।

কবি সুলতানের একাধিক গুণের উল্লেখ করেছেন—'দানে ধর্মে হরিশ্চন্দ্র', 'মানে গুরুসম ইন্দ্র', 'সুচরিত সুবুদ্ধি সুঠাম', 'জ্ঞানে গুণবন্ত' ইত্যাদি। শামস্উদ্দীন ইউসুফ শাহ দানশীল, ধর্মনিষ্ঠ ও প্রজাহিতৈষী ছিলেন তা আরবী-ফারসীতে লেখা ঐতিহাসিক গ্রন্থ থেকে জানা যায়। 'তবকাৎ-ই-আকবরীর' রচয়িতা ঐতিহাসিক খাজা নিজামউদ্দীন আহমদ (১৫৫১-'৯৪ খ্রীঃ) লিখেছেন, সুলতান ইউসুফ শাহ ধৈর্যশীল, প্রজাহিতৈষী

---

৪. বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর : পৃঃ ৯১

৫. **History of Bengal, vol. 11, (Ed.) Sir Jadunath Sarkar, P. 136.**

এবং ধর্মপ্রাণ অধিপতি ছিলেন।[৬] ইউসুফ শাহ 'জ্ঞানে গুণবন্ত' ও 'সুবুদ্ধি সুঠাম' ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় মুহম্মদ কাসিম ফিরিস্তা রচিত 'তারিখ-ই-ফিরিস্তা' গ্রন্থে। নেওয়াল কিশোর প্রেস, লখ্‌নৌ থেকে উর্দুতে প্রকাশিত উক্ত গ্রন্থের নিচের বাক্যগুলি উল্লেখযোগ্য ঃ

"বাদশাহ খেলাতে এল্‌ম্‌ ও ফজল্‌সে আরাস্তা থা।"

"খোদ বিহি এলম্‌সে বহরা রাখ্‌তা থা।"[৭]

বাংলা তরজমা করলে দাঁড়ায়, 'সুলতান জ্ঞান ও বিদ্যায় ভূষিত ছিলেন', 'সুলতান স্বয়ং জ্ঞানে ভরপুর ছিলেন।' ফিরিস্তা আরও বলেছেন, সুলতান ইউসুফ শাহ ধর্মের আইনকানুন নিজে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেন এবং সভাসদদের তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ধর্মের নির্দেশ ও ন্যায়নীতি ভঙ্গকারীকে কঠোর শাস্তির বিধান দিয়েছিলেন। তিনি নিজে এমনই সুপণ্ডিত ছিলেন যে, কাজীরা বিচারে ব্যর্থ হলে তিনি তার নিষ্পত্তি করে দিতেন। ইউসুফ শাহ বাংলায় অনেকগুলি মসজিদ নির্মাণ করিয়েছিলেন। পাণ্ডুয়ার 'বাইশ দরজা' মসজিদটি তাঁরই নির্মিত। যিনি ইসলামের তারিখা ও হকিকত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেন তিনি হযরত মুহম্মদ (দঃ) এর বিজয় কাহিনী ও ধর্মীয় বাণী শোনার জন্য কবি জৈনুদ্দিনকে কাব্যরচনায় অনুপ্রাণিত করবেন, তা সংগত ও স্বাভাবিক। রসুল বিজয়ের অমৃতবাণী শুনে সুলতানের হৃদয় 'পরিতোষ' লাভ করত। জৈনুদ্দিন সুলতানের 'আরতি কারণ' তথা ধর্ম পিপাসা নিবৃত্তির জন্য কাব্যরচনা করেছিলেন তাঁর আত্ম-স্বীকৃতিতে সে প্রমাণ নিহিত।

---

৬. **"He was a patient badshah and a well-wisher of his subjects, and of a virtuous disposition."**

The Tabaqat – 1—Akbari of Khwajah Nizamuddin Ahmed Vol. III. Trans by Brajendranath De, The Royal Asiatic Society of Bengal, Calcutta, 1939, P. 436.

৭. **তরজমায়ে তারিখ-ই-ফিরিস্তা উর্দু, ২য় খণ্ড, ১৯১৪ (৪র্থ সং); পৃঃ ৪৯৫**

কবির বর্ণনানুসারে অনুমিত হয়, ইউসুফ শাহ বাংলা ভাষা অবগত ছিলেন ('শুনি পরিতোষ ভেল ইছপ নায়ক।')। তাঁর মত জ্ঞানী, উচ্চশিক্ষিত ও বুদ্ধিমানের পক্ষে বাংলা শেখা সংগত। রাজদায়িত্ব অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত যে ভাষার সঙ্গে সুলতান তা আগ্রহের সহিত শিখেছিলেন বলা যায়।

সুলতান বারবক শাহের সভাকবি আমীর জৈনুদ্দিন হারয়ী, কবি জৈনুদ্দিন হতে পারেন কিনা সে সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতে পারে। আমরা পূর্বে বলেছি, আমীর জৈনুদ্দিন হারয়ী বারবক শাহের কাছ থেকে উপাধি পেয়েছিলেন, কিন্তু পরবর্তী কবি কোন খেতাব প্রাপ্তির কথা বলেননি। খেতাবের নাম 'মালেকুল শোয়ারা' দৃষ্টে মনে হয়, পূর্ববর্তী কবি বাংলা ভাষাভাষী ছিলেন না এবং বাংলা কেতাবের জন্যও তা প্রদান করা হয়নি। তিনি বাঙালী বা বাংলা ভাষার কবি হলে তাঁর আমলে সুলতান প্রদত্ত অন্যান্য বাংলা পদবীর (গুণরাজ খান, সত্যরাজ খান ও শুভরাজ খান) মত তিনিও ঐরূপ খেতাব পেতেন। 'মালেকুল শোয়ারা' আরবী শব্দ; কবি উক্ত ভাষায় অথবা ফারসীতে কাব্যরচনা করে থাকতে পারেন।

আমাদের কবিও ফারসী জানতেন, কাব্যের মূলকাহিনী ও অন্যান্য তথ্য সংগ্রহে কবির স্বীকৃতিতে তা বুঝা যায়। তিনি লিখেছেন,

"বিস্তর আছিল যুদ্ধ কিতাবে লিখন।
কিঞ্চিত লেখিলু লোকে জানিতে কারণ॥"

ডঃ এনামুল হক সাহেবের মতে, কবির সাহায্যকৃত এ 'কিতাব' ফারসীগ্রন্থ ছাড়া আর কিছুই নয়,[৮] কিন্তু কোন্ ফারসীগ্রন্থ থেকে কি পরিমাণ তথ্য গৃহীত বা কাহিনী অনুদিত হয়েছে তা বিশ্লেষণ করেননি। একই শিরোনামায় প্রায় একই বিষয়বস্তু নিয়ে আরও

৮. মুসলিম বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ৬২

তিনজন কবির নাম পাওয়া যায়—আমরা এঁদের নাম করেছি সৈয়দ সুলতান, শা'বিরিদ খান ও শেখ চাঁদ। এঁদের মধ্যে শেখ চাঁদ তাঁর কাব্যের ভূমিকায় লিখেছেন—

"কাছাছুল-আম্বিয়া এক কিতাবেত শুনি।
পাঞ্চালী বাঁধিয়া তাকে পুস্তকেত ভণি॥"

(রসুলবিজয়)

'কিসাসুল আম্বিয়া' সা'লাবি রচিত আরবী গ্রন্থ। এতে নবীগণের জীবন ও বাণীর বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। শেখ চাঁদ ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগ অথবা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের কবি। প্রায় একশো বছর আগে কবি জৈনুদ্দিন একই গ্রন্থ থেকে উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন কিনা সে সম্বন্ধে সুনিশ্চিত কিছু বলা যায় না। ডঃ এনামুল হকের মতে যদি কবি ফারসী গ্রন্থের ভাবানুবাদ করে থাকেন, তবে আরবী কেতাব 'কিসাসুল আম্বিয়া'র সহিত কবির অপরিচয়ের প্রশ্ন ওঠে না। আমাদের মনে হয়, ধর্মশাস্ত্র হিসেবে বাংলাদেশে গ্রন্থখানির প্রচার ছিল। ষোড়শ শতকের কবি সৈয়দ সুলতান উক্ত গ্রন্থ থেকে 'নবীবংশ' ও 'রসুলবিজয়' কাব্যদ্বয়ের উৎসানুসন্ধান করেছেন বলে ডঃ শহীদুল্লাহ সাহেব অভিমত পোষণ করেন।[১] সম্ভবত জৈনুদ্দিন আরবী ফারসী গ্রন্থ থেকে কাব্যের কাহিনী নির্বাচন করেছেন। 'রসুলবিজয়' কাব্যে বর্ণিত হিন্দু রাজা জয়কুমারের সহিত হজরত মুহম্মদ (দঃ) এর যুদ্ধ বর্ণনার কাহিনী নিয়ে তিনজন

১. বাংলা সাহিত্যের কথা, পৃঃ ৩২৩

'নবীবংশে'র ভনিতায় কবি বলেছেন—

"কহে ছৈদ সুলতান সুন নরগণ।
এহি মত নবীবংশ সুন দিয়া মন॥
আছিল আরবী ভাষা হিন্দু আনি কৈলুঁ।
বঙ্গদেশী বুঝে মত প্রচারিয়া দিলুঁ॥"

কবি রচিত 'জয়কুমার রাজার লড়াই' শীর্ষক পুঁথি কাব্য পাওয়া যায়। উক্ত কবিত্রয় আকিল মুহম্মদ, সোলেমান এবং সৈয়দ সুলতান।[১০] জয়কুমার সম্ভবত ঐতিহাসিক চরিত্র (আরমেনিয়ার রাজা) ; তাঁর সম্বন্ধে বিবরণ পেলে এ বিষয়ে অজ্ঞানতা দূর হয়।

অনেকে 'মঙ্গলকাব্য' অনুযায়ী 'বিজয়কাব্য'কে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একটি ধারা হিসেবে গণ্য করতে চান। রাজনীতিতে পরাভূত হিন্দু-মানসিকতা লৌকিক দেবদেবীর মাহাত্ম্যকীর্তনে ও স্তব-স্তুতিতে ধর্মীয় ভাবাকুলতায় মুক্ত আশ্রয় খুঁজেছিল। আধিপত্য বিস্তারে ক্রমোৎসাহিত বিজয়ী মুসলমান রাজনৈতিক ক্ষমতা অব্যাহত এবং ধর্মীয় প্রভাব প্রসারিত করার অভিপ্রায়ে মহাপুরুষদের জীবন কথা ও ঐতিহাসিক বীরদের গৌরবগাথা রচনা করে বিজয়কাব্যের ধারা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। মধ্যযুগীয় জীবনবোধের পরিপ্রেক্ষিতে এরূপ অনুমান অকল্পনীয় নয়। তবে 'বিজয়কাব্য' রচনায় মুসলমান কবিদের সাধনা এবং সৃষ্টি-বৈচিত্র্য সতর্ক প্রচেষ্টায় কতখানি ব্যাপকতা ও সার্থকতা লাভ করেছিল আজ তা হিসেবের অপেক্ষা রাখে। বিদেশী আরবী ফারসী ভাষায় লিখিত ধর্মবাণী ও কর্মাদর্শ এদেশীয় অশিক্ষিত জনসাধারণ উপলব্ধি করতে পারত না বলে কবিগণ সতর্ক জ্ঞানেই লৌকিক ভাষায় কাব্যরচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন একথা সত্য।[১১]

---

১০. শা'বারিদ খানের গ্রন্থাবলী—সম্পাদনা ; আহমদ শরীফ, বাঙলা একাডেমী, ১৩৭৩ ভূমিকা '৬' পৃষ্ঠা

১১. সৈয়দ সুলতান তাঁর নবীবংশ কাব্যের (১৫৫৬ খ্রীঃ) ভূমিকায় বলেছেন,

'আরবী ফারসী ভাষে কিতাব বহুত।
আলিমানে বুঝে ন বুঝে মুর্খসুত ॥
দুঃখ ভাবি মনে মনে করিলুং ঠিক।
রছুলের কথা যথ কহিমু অধিক ॥"

কিন্তু বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যের সহিত তুলনায় বিজয়কাব্যের বৈচিত্র্য ও ও প্রচার এমন নগণ্য যে, স্বতন্ত্রভাবে কোন সাহিত্যিক গবেষণার অপেক্ষা রাখে বলে মনে হয় না। ডঃ সুকুমার সেনের মতে এক 'মনসামঙ্গল' কাব্যের রচয়িতার সংখ্যা একশতেরও অধিক।[১২] বিভিন্ন পুঁথির ভণিতায় প্রাপ্ত ৬২ জন কবির নাম করেছেন ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন।[১৩] বিজয়ান্তক শিরোনামার সার্থকতার অনুসন্ধানে ডঃ এনামুল হক সাহেব লিখেছেন, " 'বিজয়' শব্দের সাধারণ অর্থ 'প্রতিপক্ষের পরাভব' ব্যতীত আর এক অর্থ 'প্রাধান্য' বা 'শ্রেষ্ঠত্ব' এবং আরও এক অর্থ 'গমন' বা 'প্রস্থান'। বাংলা 'বিজয়কাব্য'-গুলিতে এই শেষোক্ত দুই

'কিফায়তুল মুসল্লীন' গ্রন্থের রচয়িতা শেখ মুত্তালিব লিখেছেন—

"আরবীতে সকলে ন বুঝে ভালমন্দ।
তে কারণে দেশী ভাষে রচিনু প্রবন্ধ॥"

'সা'আতনামা' গ্রন্থে মুজাম্মিল সাহেব লিখেছেন—

"আরবী ভাষএ সবে ন বুঝে কারণ।
সভানে বুঝিতে কৈলুম পয়ার রচন॥"

আবদুল করিম সাহেব 'নূরনামা' গ্রন্থে বলেছেন—

"পারসী ভাষে এসব না বুঝে সর্বজন।
দিশিয়াশি তাপি চুমি করএ রচন॥
আবদুল করীমে এবে মনেত ভাবিয়া।
বাঙ্গলা রচিলা তবে প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া॥"

শেখ সুলায়মান 'নসীহতনামা'য় লিখেছেন—

"ভাষাএ পারসী কহে নারএ বুঝিতে।
বাঙ্গালা রচিলুম তবে সকলে পড়িতে॥"

১২. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, পৃঃ ৯৭

১৩. বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য, পৃঃ ২৬৩

অর্থের দ্যোতনা রহিয়াছে। বাংলার মুসলমানেরাও তাঁহাদের 'বিজয়-কাব্যে' শব্দটির এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছিলেন।"[১৪] ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের অভিমত হল, " 'বিজয়' সাধারণতঃ দেবতার শোভাযাত্রা, কীর্তিকথা, বিজয়গৌরব—এই অর্থে সেই যুগে ব্যবহৃত হইত, এ যুগেও হয়। প্রতিমা বিজয়ার মূলেও এইরূপ তাৎপর্যই নিহিত আছে। প্রতিমা বিজয়া, অর্থাৎ নিরঞ্জনের পূর্বে শোভাযাত্রা। কাজেই শ্রীকৃষ্ণবিজয় কৃষ্ণের গৌরবলীলা অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে।"[১৫]

'বিজয়কাব্যে'র সংজ্ঞা নিরূপণে উভয় সমালোচক মোটামুটি একই মত পোষণ করেন। হিন্দু রচিত বিজয়কাব্যের সহিত তুলনায় মুসলমান রচিত বিজয়কাব্যের রসতাৎপর্য ও কাব্যপরিণতি বিশ্লেষণ করে বলা যায়, হিন্দুগণ যেখানে দেবতার স্তুতিবন্দনায় আত্মনিবেদন করে থেমে গেছেন, সেখানে মুসলমানগণ সে পথে বিচরণ নীতিবিরোধী বলে ঐতিহাসিকতা ও বাস্তবতার প্রতি অধিক নজর দিয়ে প্রকৃতপক্ষে গৌরবলীলার বিজয়-পতাকা উড্ডীন করে একাধারে পাঠকমনে ঐতিহ্যমহিমায় বীররসের সঞ্চার করেছেন, অপর দিকে আপন মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার জাতীয় প্রস্তুতির গুরুত্ব উপলব্ধিতে মানসিক শৌর্যের অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন। বাস্তবিক, বাঙালী মুসলমান পাঠক সমাজে 'রসুলবিজয়' কাব্যের যদি কোন স্থায়ী মূল্য থাকে তবে এখানেই তার অবদান অনুসন্ধান করতে হবে। কবি জৈনুদ্দিন সর্বপ্রথম সে উৎসদ্বার উন্মোচন করে দিয়েছেন। আমরা কবিকে ঐতিহাসিক মূল্য দিতে যেন কার্পণ্য না করি। এখানে উল্লেখ্য 'রসুলবিজয়' কাব্যে ঐতিহাসিক নিষ্ঠার চেয়ে কাল্পনিক গল্পের অধিক আশ্রয় নেওয়া হয়েছে।

---

১৪. মুসলিম বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ১০৯

১৫. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (১ম খণ্ড), পৃঃ ৫৯৬

সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহ

(১৪৯৩—১৫১৯ খ্রীঃ)

বিজয়গুপ্ত ॥ মনসামঙ্গল

বিপ্রদাস ॥ মনসাবিজয়

যশোরাজ খান ॥ বৈষ্ণবপদ

বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং পরিপুষ্টতায় হুসেন শাহী বংশের (১৪৯৩—১৫৩৮ খ্রীঃ) সুলতানদের অবদান চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। প্রথম সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহের আমল নানা বৈশিষ্ট্যে ঐতিহাসিক মর্যাদা পেয়ে আসছে। রাজনৈতিক ক্ষমতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আভ্যন্তরীণ শান্তি প্রতিষ্ঠায় জনগণের জীবনবোধে আস্থার সঞ্চার হয়েছিল। হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক সমঝোতার চূড়ান্ত ফলশ্রুতি তাঁরই আমলে দৃষ্টিগোচর হয়। উদার ও মুক্ত জীবন-চর্যায় সেদিন বৈষ্ণবধর্মের বিকাশে কোন প্রতিবন্ধকই ব্যাঘাত সৃষ্টি করেনি। বিরুদ্ধচারিতায় রাজরোষ মুষ্টিমেয় ব্রতচারীর কণ্ঠরোধ করতে পারত, কিন্তু সুলতান হুসেন শাহ সে নীতির ধারক ছিলেন না। সেদিন স্বচ্ছন্দ মানবতার জয়গান বিঘোষিত হয়েছিল। জীবনযাত্রার যখন দুর্বিপাক তিরোহিত, ধর্মচর্চায় অবাধ অধিকার প্রতিষ্ঠিত তখন সাহিত্য-সংস্কৃতির সাফল্যের প্রশস্ত যুগ-ক্ষেত্র রচিত হয়েছে। হুসেন শাহের

আমলেও এর ব্যত্যয় ঘটেনি। কাব্যজগতে কেবল পুরাতন ধারার বিকাশ নয়, নতুন শাখার উদ্ভাবনেও এ যুগের একটা স্বতন্ত্র মুল্য আছে। এ যুগের সাহিত্য-সমালোচক সুলতানের স্বয়ং এবং তাঁর সভাপার্ষদদের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন।

ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন, "পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দশকে এবং পরবর্তী শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে আলাউ-দ-দীন মুজফ্‌ফর হুসৈন শাহ গৌড়ের তক্তে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইনি কোন কবি বা পণ্ডিতকে বিশেষ করিয়া সংবর্ধনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় নাই বটে, কিন্তু বড় বড় অনেক কবি ও মনীষীকে নিজ সভায় উচ্চপদ দিয়া অবান্তরভাবে বাঙালীর সংস্কৃতি ও সাহিত্যের পোষকতা করিয়াছিলেন। দণ্ডপাণি সুশাসক বলিয়া হউক, অথবা যে কোন কারণেই হউক, ইঁহার যশ অত্যল্প কাল মধ্যেই গৌড়বঙ্গের সুদূর পল্লীতেও ব্যাপ্ত হইয়াছিল। সমসাময়িক একাধিক কবি সুলতান হুসেন শাহের দোহাই দিয়াছেন।"[১]

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেব বলেছেন,

"পঞ্চদশ শতকের শেষে আলাউদ্দীন হুসেন শাহ গৌড়ের তখ্‌তে বিরাজ করিতেছিলেন। হুসেন শাহ বাংলা সাহিত্যের উৎসাহদাতা ছিলেন। যাঁহার অমাত্য পুরন্দর খাঁ, দবীর খাস রূপ এবং সভাসদ সনাতন, তিনি বাংলা ভাষাকে প্রীতির চক্ষে না দেখিবেন কেন? তাঁহার সময়কে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের সুবর্ণযুগ বলা যাইতে পারে।"[২]

ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক সাহেবের অভিমত,

"উদার দৃষ্টি ও সমুচ্চ আদর্শ-সমন্বিত যে ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষা ও সংস্কৃতি, তাহাতে হুসেন শাহ পরিপূর্ণ ছিলেন। তিনি জন্মের দিক

১. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, পৃঃ ৭২

২. বাংলা সাহিত্যের কথা, পৃঃ ৯৭

হইতে খাঁটি আরবী হইলেও, স্থানীয় এক বাঙালী-পরিবারে তাঁহার বিবাহ হয়। ইহাতে তাঁহার সহিত বাঙলার মূল অধিবাসীর এক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। ইহার পরিণাম বাংলার পক্ষে অতি ফলদায়ক হইয়াছিল।" [৩]

সুলতান হুসেন শাহ সম্বন্ধে আধুনিক সমালোচকদের এসব ধারণা অনুমানাশ্রিত নয়, সমসাময়িক কবিদের অকুণ্ঠ প্রশস্তিগান ও স্তুতিবচনে এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। সুলতানের নামযুক্ত নীচের শ্লোক বা চরণগুলি উল্লেখ্য ঃ

"ঋতু শশী বেদ শশী পরিমিত শক।
সুলতান হোসেন সাহা নৃপতি-তিলক॥
সংগ্রামে অর্জুন রাজা প্রতাপেতে রবি।
নিজ বাহুবলে রাজা শাসিল পৃথিবী॥
রাজার পালনে প্রজা সুখ ভুঞ্জে নিত।" [৪]

(বিজয়গুপ্ত)

"সিন্ধু ইন্দু বেদশশী শক পরিমাণ।
নৃপতি হুসেন সাহ গৌড়ে সুলতান॥"

(বিপ্রদাস)

---

৩. মুসলিম বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ৩৫

৪. ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থে (পৃঃ ১১১-২) নিম্নরূপ পাঠান্তর লিপিবদ্ধ করেছেন ঃ

"ঋতুশশী বেদশশী পরিমিত শক।
সনাতন হুসেন সাহ নৃপতি তিলক॥
উত্তরে অর্জুন রাজা প্রতাপেতে যম।
মুল্লুক ফতেয়াবাদ বাদবোড়া তক সীম॥
পশ্চিমে ঘাঘরা নদী পূর্বে ঘণ্টেশ্বর।
মধ্যে ফুলশ্রী গ্রাম পণ্ডিত নগর॥"

"নৃপতি হুসেন শাহ হএ মহামতি।
পঞ্চম গৌড়েতে যার পরম সুখ্যাতি॥
অস্ত্রেশস্ত্রে সুপণ্ডিত মহিমা অপার।
কলিকালে হৈল যেন কৃষ্ণ অবতার॥"

(কবীন্দ্র পরমেশ্বর)

"নৃপতি হুসেন শাহ, সেহ ক্ষিতিপতি।
সামদান দণ্ড ভেদে পালএ বসুমতি॥"

(শ্রীকর নন্দী)

"শ্রীযুত হুসন জগত ভূষণ
সেহ ইহ রস জান।
পঞ্চগৌড়েশ্বর ভোগ পুরন্দর
ভনে যশোরাজ খান॥"

(যশোরাজ খান)

সুলতানের প্রশংসাকারী কবিগণের মধ্যে বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস ও যশোরাজ খান হুসেন শাহের প্রত্যক্ষ অনুগ্রহ লাভ করতে পারেন; কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দী পরোক্ষভাবে গৌড়েশ্বরের সহানুভূতি লাভের দাবীদার ছিলেন। সম্ভবতঃ 'যশোরাজ খান' নাম নয়, উপাধি। হুসেন শাহ কবির বৈষ্ণবপদের কাব্যরসে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে উক্ত খেতাব দান করেন।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বিপুল ধারা মঙ্গলকাব্যের প্রাচীনতম শাখা মনসামঙ্গলের অন্যতম প্রাচীন কবি বিজয়গুপ্ত। কানা হরিদত্ত প্রাচীনতম কবি, কিন্তু তাঁর কোন পুঁথি পাওয়া যায়নি। বিজয়গুপ্ত তাঁর ভনিতায় কানা হরিদত্তের কাব্যের নাম করেছেন। সুতরাং প্রামাণিকভাবে প্রাপ্ত মনসামঙ্গলের আদিকবি বিজয়গুপ্তই।

বিজয়গুপ্ত বরিশাল জেলার ফুল্লশ্রী গ্রামের অধিবাসী। কবি প্রদত্ত রচনাকাল বিশ্লেষণ করে পণ্ডিতগণ স্থির করেছেন, কবি ১৪১৬ শকাব্দ

বা ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে 'মনসামঙ্গল' রচনা করেন। এর এক বছর আগে সুলতান হুসেন শাহ গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। হুসেন শাহ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর যশ সুদূর বরিশাল জেলার ফুল্লশ্রী গ্রামে পৌঁছেছিল কি না, সে সম্বন্ধে ডাঃ সুকুমার সেন সন্দেহ পোষণ করেন।[৫] সিংহাসন লাভের এক বছরের মধ্যে সুলতানের খ্যাতি বরিশালে প্রসারিত হতে বাধা নেই, বিশেষতঃ গৌড়ের রাজদরবারে তিনি আগে থেকেই বর্তমান ছিলেন। হাবসী সুলতানদের অধীনে দেশে অরাজকতা দেখা দিয়েছিল। মাত্র পাঁচ-ছয় বছরে চারজন সুলতানের যুগ অতিক্রান্ত হয়। রাজধানীতে হত্যা ও উত্থান-পতনের বিশৃঙ্খলায় জনসাধারণের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হওয়া অসম্ভব ছিল না। রাজ-সিংহাসন এবং প্রজাপুঞ্জ উভয়ই একজন যোগ্য উত্তরাধিকার আশা করছিল।

আমাদের প্রশ্ন হল, বিজয়গুপ্ত হুসেন শাহের যে গুণ বর্ণনা করেছেন, রাজ্যাধিকারের অত্যল্প কালের মধ্যে সুলতান সে মর্যাদা অর্জনের অবকাশ পাননি, যদিও সমস্ত রাজত্বকালের ইতিহাসে এর সব বৈশিষ্ট্যেরই অধিকারী তিনি। তিনি 'নিজ বাহুবলে' সিংহাসন দখল করেছিলেন ঠিক, কিন্তু 'পৃথিবী' তথা অন্যান্য রাজ্য দখল করেছিলেন কবির কাব্যরচনার অনেক পরে। তবু বলা যায়, কাব্য সমাপ্তির পরেও কবি জীবিত ছিলেন এবং সুলতানের প্রশস্তিজ্ঞাপক শ্লোকটি পরে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। সুলতানের সহানুভূতির আকর্ষণ মানসে কবি এরূপ করতে পারেন।

আসল প্রশ্ন ভিন্ন। তাঁর কালজ্ঞাপক চরণটির অভ্রান্ততা অনেকে বিশ্বাস করেন না। কোন পুঁথিতে নাকি উক্ত চরণটি পাওয়া যায়না। প্রকৃত চরণটি হল 'ঋতু শূন্য বেদশশী পরিমিত শক।' এতে

৫. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, পৃঃ ১০০

১৪০৬ শকাব্দ বা ১৪৮৪ খ্রীষ্টাব্দ সূচিত হয়। এ সময় গৌড়ের সিংহাসনে জালালউদ্দীন ফৎহ্ শাহ (১৪৮১—'৮৭ খ্রীঃ) অধিষ্ঠিত ছিলেন। ঐতিহাসিকগণ মনে করেন, 'জালালউদ্দীন ফৎহ্ শাহ' নাম গ্রহণ করে যিনি তখ্‌তে বসেছিলেন তাঁর পূর্ব নাম ছিল 'হুসাইন'। 'হুসাইন শাহী' নামাঙ্কিত তাঁর মুদ্রা পাওয়া গেছে। সুতরাং এ নামটি তাঁর প্রিয়, এবং জনসাধারণের কাছে এ নামেই সুপরিচিত ছিলেন।[৬] জালালউদ্দীন ফৎহ্ শাহ সুযোগ্য সুলতান ছিলেন। তাঁর বুদ্ধি-প্রাখর্য এবং চিত্ত-ঔদার্যের প্রশংসা করে 'তবকাৎ-ই আকবরী'র রচয়িতা খাজা নিজামউদ্দীন আহমদ যে মন্তব্য করেছেন তার ইংরেজী অনুবাদ নিম্নরূপ :

"He was intelligent and wise ; and placing the usages of ancient rulers and Sultans in the forefront of his spirit, distributed favours to everyone in accordance with his condition and rank. In his time the doors of pleasure and enjoyment remained open in the faces of the people." [৭]

ফৎহ্ শাহের আমলেই ধ্রুবানন্দ মিশ্র তাঁর সামাজিক ইতিহাস 'মহাবংশাবলী' (১৪৮৫খ্রীঃ) রচনা করেন। স্বীয় চিৎ-প্রকর্ষ, প্রজাসাধারণের সুখ-শান্তিতে বসবাস এবং সাহিত্যিকের আবির্ভাব প্রমাণ করে, ফৎহ্ শাহের আমলে সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার একটা প্রশস্ত ক্ষেত্র রচিত হয়েছিল। এই যুগ-পরিবেশ, সুলতানের আঞ্চলিক নাম-সাদৃশ্য এবং কবি-প্রদত্ত কালের মিলন-সাকুল্যে বিজয়গুপ্তের উল্লিখিত সুলতান ফৎহ্ শাহ (ওরফে হুসেন শাহ) অনুমান অযৌক্তিক নয়। সুলতান ফৎহ্ শাহ হন, অথবা আলাউদ্দিন হুসেন শাহ হন, উভয়ের রাজত্বের দূরত্ব অতি

৬. **History of Bengal, Vol. II. P. 136.**

৭. **The Tabaqat-1-Akbari, Vol. III, tran. by Rajendra Nath De. Calcutta, 1939, P. 437—38.**

অল্প বলে এবং গৌড়েশ্বরের সহিত কবির প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপিত হয়নি বলে এ সম্বন্ধে অধিক চিন্তা নিষ্প্রয়োজন। মনসাদেবীর স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে কবি মনসামঙ্গল রচনা করেছিলেন। সুলতানের প্রশস্তি রচনায় তাঁর অনুগ্রহ লাভের হয়ত গোপন আকাঙ্ক্ষা ছিল; কবি গৌড়েশ্বরের দৃষ্টি আকর্ষণ না করলেও গৌড়জনপদের হৃদয়হরণ করেছিলেন; সারা বাংলায়, বিশেষতঃ পূর্ব বাংলায় কাব্যখানির জনপ্রিয়তা ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব অক্ষয় অবদান হিসেবে কবির যশের আকর হয়ে আছে।

মনসামঙ্গলের অন্য রচয়িতা বিপ্রদাস পিপিলাই প্রদত্ত কাব্যের রচনাকাল ১৪১৭ শকাব্দ বা ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দ। তিনি ২৪ পরগণার বসিরহাট মহকুমার বাদুড্যা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আত্ম-বিবরণীতে কেবল একটি চরণে গৌড়াধিপতি সুলতান হুসেন শাহের নাম করেছেন। কেন করেছেন এ সম্বন্ধে মত ব্যক্ত করেন নি। মনসা কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে কাব্যরচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন। দেবী কর্তৃক স্বপ্নে আদেশপ্রাপ্ত হওয়া তৎকালীন কবিদের বাতিক বা 'ভান' ছিল মনে করা যেতে পারে। ঠিক অনুরূপভাবে দু' একটি চরণে সুলতানের নাম ও মহিমাকীর্তন করাও প্রথায় পরিণত হয়েছিল। বিজয়গুপ্তের মত বিপ্রদাস পিপিলাইকেও হুসেন শাহ প্রত্যক্ষভাবে কাব্যরচনায় উৎসাহিত বা অনুপ্রাণিত করেছিলেন কি না তার স্বীকৃতি তাঁদের রচনায় পাওয়া যায় না।

বৈষ্ণবপদকার যশোরাজ খানকে সুলতান সম্ভবতঃ উপাধি দিয়েছিলেন। সুলতানের প্রশস্তিমূলক শ্লোকটি কবি ও সুলতানের নৈকট্য ও ঘনিষ্ঠতার সাক্ষী বহন করে।[৮] ডঃ এনামুল হক সাহেব এ সম্বন্ধে

৮. জসরাজ খান দামোদর মহাকবি।
কবিরঞ্জন আদি সবে রাজসেবী।
'রসকল্পবল্লী'র (রাম গোপাল দাস রচিত) উক্ত পদ সাক্ষ্য দেয় যশোরাজ খান রাজকর্মচারী ছিলেন।

মন্তব্য প্রকাশ করে বলেছেন, "শ্রীখণ্ডের কবি যশোরাজ খান হুসৈন শাহের কর্মচারী হইলেও, একটি ব্রজবুলি পদে বাদশাহের যে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে কবির প্রভুভক্তির চেয়েও বাদশাহের বাংলা-সাহিত্য ও ভাষাপ্রীতির নিদর্শন অধিক মিলে। তিনি হুসৈন শাহকে শুধু 'জগৎ-ভূষণ' বলিলে তাঁহার প্রভুভক্তির কথা বলিয়া মনে করা স্বাভাবিক হইত, কিন্তু তিনি যখন বাদশাহকে বিদগ্ধ বা রসজ্ঞজন বলিয়া উল্লেখ করেন, তখন বাদশাহের বৈদগ্ধ্যের কথা ভুলিয়া যাওয়া যায় না।"[৯]

হুসেন শাহের নামযুক্ত যশোরাজ খানের এই পদটি ব্রজবুলির প্রাচীনতম নিদর্শন বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন। সুলতান এর রসাস্বাদন করেছেন এবং মুগ্ধ হয়েছেন—এরূপ বর্ণনায় তাঁর বাংলা কাব্যপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। রসরাজ সুলতান কবিকে 'যশোরাজ' উপাধি দিয়ে গুণেরই যথার্থ মর্যাদা দিয়েছিলেন তা স্বীকার্য।

সুলতানের চট্টগ্রামস্থ সেনাপতি ও প্রতিনিধি পরাগল খান ও তৎপুত্র ছুটিখানের প্রত্যক্ষ নির্দেশে যথাক্রমে কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারতের 'স্ত্রীপর্ব' ও শ্রীকর নন্দী 'অশ্বমেধপর্বে'র অনুসরণে বাংলা মহাভারত কাব্য রচনা করেছিলেন। তাঁরা স্ব স্ব আত্মকাহিনীতে অকুণ্ঠচিত্তে তা স্বীকার করেছেন। কবীন্দ্র লিখেছেন :

"শ্রীযুত লস্কর খাজা অতি সে সুমতি।
এ তিন ভুবনে তেঁহ অনাথের গতি॥
লস্কর পরাগল শুনন্ত কাহিনী।
যেন-মতে পাণ্ডবে হারাইল রাজধানী॥
বনবাসে বঞ্চিলেক দ্বাদশ বৎসর।
কেন-মতে ধর্ম রইল বনের ভিতর॥
বৎসরেক আছিলন্ত অজ্ঞাত-বসতি।
কেন-মতে তারা সবে পাইল বসুমতি॥

৯. মুসলিম বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ৩৬

এহি সব কথা কহ সংক্ষেপিয়া।
দিনেকে শুনিতে পারি পাঁচালী রচিয়া॥
তাঁহার আদেশমাল্য মস্তকে করিয়া।
কবীন্দ্র পরমযত্নে পাঁচালী রচিয়া॥"

শ্রীকর নন্দীর উক্তি ঃ

"লস্কর পরাগল খানের তনয়।
সমরে নির্ভএ ছুটি খান মহাশয়॥
পণ্ডিত মণ্ডিত সভা খান মহামতি।
একদিন বসিলেক বান্ধব সংহতি॥
শুনন্ত ভারত তবে অতি পুণ্য কথা।
মহামুনি জৈমিনির রচিত সংহিতা॥
অশ্বমেধ-কথা শুনি প্রসন্ন হৃদয়।
সভাখণ্ডে আদেশিল খান মহাশয়॥
দেশ-ভাষে এহি কথা রচিল পয়ার।
সঞ্চারৌক কীর্তি মোর জগৎ-সংসার॥
তাহান আদেশমাল্য মস্তকে ধরিয়া।
শ্রীকর নন্দীএ কহে পাঞ্চালী রচিয়া॥"

আদিকবি ব্যাস রচিত 'মহাভারত' মহাকাব্য একখানি পুরোপুরি রাজকাহিনী। রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, রাজ্যের উত্থান-পতন, পরাক্রান্ত দুটি রাজশক্তির সংগ্রাম, সমরক্ষেত্রে অসির ঝংকার আর বীরত্বের হুংকারে মহাকাব্যের প্রতিটি পাতা মুখরিত ও পরিপূরিত। ত্রিপুরা এবং আরাকানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ ও বিজয়ী হয়ে পরাগল খান ও ছুটি খান বীরত্বের গৌরবকাহিনী শুনতে আগ্রহ প্রকাশ করবেন, তা অতি স্বাভাবিক। বীরের মহিমা বীরেই বুঝেন। সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ সুলতান অনুবাদের জন্য বাঙালী কবিকে আমন্ত্রণ জানালেন। কবীন্দ্র ও নন্দী নরপতির আমন্ত্রণ ও আদেশ শিরোধার্য করে কাব্যরচনায়

আত্মনিয়োগ করলেন। প্রথম বাংলা মহাভারতের অনুবাদ করলেন কবীন্দ্র পরমেশ্বর। সুলতানের সঙ্গে সারা বাঙালী সেদিন বীররসে অবগাহন করে প্রাচীন ঐতিহ্যের মর্মোপলব্ধি করেছিল। কবীন্দ্র স্বীয় অনুগ্রাহক পরাগল খানের প্রশংসায় পঞ্চমুখ—তাঁর কাব্যের পাতায় পাতায় কৃতজ্ঞতার স্বীকৃতি। এজন্য গ্রন্থখানি 'পরাগলী মহাভারত' রূপে পরিচিতি লাভ করে।

পিতার যোগ্য উত্তরাধিকারী হিসেবে ছুটি খান তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। ত্রিপুরাধিপতিকে যুদ্ধে পরাজিত করে তিনিও যশের অধিকারী। শ্রীকর নন্দী তাঁর কাব্যরস পিপাসা নিবৃত্তির জন্য দ্বিতীয় প্রাচীনতম বাংলা মহাভারতের সৃষ্টি করলেন।

উভয় কবিই পৃষ্ঠপোষকের নামের পূর্বে সুলতান হুসেন শাহের প্রশংসা জুড়ে দিয়েছেন। এতে গৌড়েশ্বরের অনুগ্রহভাজন হবেন সত্য, এও সত্য যে, বীররসের কাব্য শ্রবণে স্বয়ং সুলতানেরও আগ্রহবোধ ছিল।

'বিদ্যাসুন্দর কাহিনী'র আদিকবি কঙ্ক হুসেন শাহের আমলে আবির্ভূত হন। তাঁর কাব্যের রচনাকাল আনুমানিক ১৫০২ খ্রীষ্টাব্দ। সত্যপীরের মহিমাপ্রচার উদ্দেশ্যে কাব্যখানি রচিত হয়। কাব্যে সুলতানের নাম নেই। একজন পীরের আদেশে কবি তা রচনা করেন। আমরা কেবল অনুমান করতে পারি, সুলতানের সুশাসনে জনগণের জীবনবোধে যে গভীর আস্থা সঞ্চারিত হয়েছিল তাতে দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকাশে নতুন নতুন দ্বার উন্মোচিত হয়েছিল।

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব এবং বৈষ্ণবধর্মের প্রচার সুলতান হুসেন শাহের রাজত্বকালের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। চৈতন্যদেব ধর্মমত ব্যাখ্যা ও প্রচারের মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষাকে বেছে নিয়েছিলেন। বৌদ্ধধর্মের আশ্রয়ে একসময় সর্বভারতীয় পালি ভাষা যে উন্নতি ও

সাংস্কৃতিক মর্যাদা লাভ করেছিল, 'গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতে'র ধারক ও বাহক হিসেবে নিখিল বঙ্গীয় লৌকিক ভাষাও উৎকর্ষ ও গৌরব লাভ করেছিল। কেবল আবেগাপ্লুত কাব্যরস নয়, জটিল তথ্য ও তত্ত্ব, ধর্ম ও দর্শন, শাস্ত্রীয় জ্ঞানগর্ভ বিষয়ের বৈদগ্ধ্যভাষণেও বাংলা ভাষা সক্ষম ও সন্নত— বৈষ্ণব পণ্ডিতদের সাধনায় ও চর্চায় সেদিন তা প্রমাণিত হয়েছিল। 'গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতে'র অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও ব্যাখ্যাতা শ্রীরূপ ও সনাতন হুসেন শাহের সভাসদ ছিলেন। রূপগোস্বামী 'সাকর-মল্লিক' এবং সনাতন গোস্বামী 'দবীর-খাস' পদে ভূষিত ছিলেন। হুসেন শাহের অধীনে থাকাকালীন রূপগোস্বামী কয়েকখানি সংস্কৃত কাব্য ও গীতিকা রচনা করেছিলেন। এগুলির মধ্যে 'উদ্ধবসন্দেশ' এবং 'গীতাবলী' উল্লেখযোগ্য।[১০]

উদারচেতা সুলতান হুসেন শাহ শ্রীচৈতন্যকে ধর্মপালন ও প্রচারের অবাধ অধিকার দিয়েছিলেন। চৈতন্যদেবের প্রেমভক্তি ও রসতত্ত্বে নিমজ্জিত হয়ে বাঙালীর কাব্যচর্চা উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেছিল। এর পশ্চাতে হুসেন শাহের কি অবদান ছিল তা বিশেষজ্ঞের মন্তব্য থেকে অনুভূত হয়। এ. বি. এম. হবিবুল্লাহ সাহেব লিখেছেন, "It is almost impossible to concieve of the rise and progress of Vaishnavism or the development of Bengali literature at this period without recalling to mind the tolerant and enlightened rule of the Muslim Lord of Gour."[১১]

শ্রীচৈতন্যের জীবনীকার কৃষ্ণদাস কবিরাজের রচনায় উক্ত মতের পূর্ণ সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে লিখেছেন—

---

১০. ডঃ সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, পৃঃ ৭৩

১১. History of Bengali, Vol. II.

"গৌড়েশ্বর যবনরাজা প্রভাব শুনিঞা।
কহিতে লাগিল কিছু বিস্মিত হইয়া॥
বিনা দানে এত লোক যার পাছে ধায়।
সেইত গোসাঞি ইহা জানিহ নিশ্চয়॥
কাজি যবন কেহো ঞিহার না কর হিংসন।
আপন ইচ্ছায় বুলুন যাহা ইহাঁর মন॥"

এ গৌড়েশ্বর নিঃসন্দেহে হুসেন শাহ; তিনি চৈতন্যদেবকে 'গোসাঞি' <গোস্বামী বলে ঘোষণা করেছেন এবং ধর্ম-কর্ম করার পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ দীর্ঘ নয় বছরের সাধনায় ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে কাব্যখানি সমাপ্ত করেন।[১২]

সুলতান হুসেন শাহের মৃত্যুর প্রায় অর্ধ শতাব্দীর পরে রচিত (১৫৬০—'৭৫ খ্রীঃ) বিখ্যাত রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান 'লায়লী-মজনু' কাব্যে দৌলত উজীর বাহরাম খান আত্মপরিচয় অংশে লিখেছেন,

"সর্বলোক নরপতি ভুবন বিখ্যাত অতি
আছিল হাসেন শাহাবর।
তান রত্ন-সিংহাসন অতিশয় বিলক্ষণ
গৌড়েত শোভিত মনোহর॥"

কবি নিজেকে সুলতানের প্রধান অমাত্য হামিদ খানের উত্তর বংশধর হিসেবে প্রতিপন্ন করতে গিয়ে এই উক্তি করেছেন। কবির আত্ম-পরিচয়ে স্বীয় বংশমর্যাদা প্রকাশে এ উক্তি সংযোজনের মধ্যে একটি অহংবোধ সক্রিয় থাকলেও সুলতান হুসেন শাহ সম্বন্ধে তাঁর মনোভাবটি অতিরঞ্জন মনে করার কারণ নেই। তাঁর খ্যাতি ও প্রতিপত্তির মাত্র ৫০ বছরের ব্যবধানে ম্লান হওয়ার কথা নয়। সেজন্য

১২. চৈতন্যচরিতামৃতে প্রদত্ত গ্রন্থ রচনা সমাপ্তির কালজ্ঞাপক শ্লোকটি নিম্নরূপ:

শাকে সিন্ধাগ্নিবাণেন্দৌ শ্রীমদবৃন্দাবনান্তরে।
সূর্যোহহ্নসিত পঞ্চম্যাং গ্রন্থোহয়ং পূর্ণতাং গতঃ॥

স্বীয় পৃষ্ঠপোষক চট্টগ্রাম অধিপতি নিজাম শাহ্ শূরের প্রশংসা করতে গিয়ে, পূর্বপুরুষের পৃষ্ঠপোষক গৌড়াধিপতি হুসেন শাহেরও নাম ও তবলিগ শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করেছেন।

কেবল বাংলা ভাষাভাষী কবি-সাহিত্যিক নন, হিন্দী, আরবী, ফারসী ভাষার কবি-পণ্ডিতগণও হুসেন শাহের গুণগান করেছেন। হিন্দুস্থানী দু'জন কবির নাম করেছেন ডঃ শহীদুল্লাহ্। তাঁরা হলেন কুতবন ও যশোধর। কুতবনের কাব্যের নাম 'মৃগাবতী'। রোমান্টিক প্রণয়কাহিনী কাব্যের বিষয়বস্তু। ডঃ সুকুমার সেনের মতে কাব্যখানি 'অবধী' বা 'পূর্বীহিন্দী' ভাষায় রচিত। তিনি কবির ও কাব্যের পরিচয় প্রসঙ্গে বলেছেন, "জৌনপুরের সুলতান শর্কী হোসেন শাহের অনুচর ছিলেন কবি। "তাঁরই সঙ্গে ইনি বাংলাদেশে পালিয়ে এসেছিলেন গৌড়-সুলতান হোসেন শাহের আশ্রয়ে। কাব্যটি লেখা হয়েছিল বাংলা দেশে গৌড়ে, ৯০৯ হিজরীতে (১৫১২ খ্রীঃ)। কাহিনীও বাংলা দেশের হওয়া সম্ভব।"[১৩]

কবি কুতবন সুলতান হুসেন শাহের এবং তাঁর দরবারের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তিনি লিখেছেন,

"সাহে হুসেন আহে বড় রাজা
ছত্র-সিংহাসন উনকো ছাজা।
পণ্ডিত অউ বুধবন্ত সয়ানা
পঢ়ে পুরান অরথ সব জানা।
ধরম দুদিষ্টিল উনকো ছাজা
হম সির-ছাহ জীয়ো জগ রাজা।
দান দেউ অউ গনত ন আবৈ
বলি অউ করণ ন সরবর পাবৈ।

১৩. ইসলামী বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ৮

রায় জহঁা লউঁ গন্দ্রয় রহহী
সেবা করহী বার সব চহহী।
চতুর খুজান ভাষা সব জনে অইস ন দেখুঁ কোয়ে
সবা সুনহুঁ সব কান দই শুনিরে দিখাবহু সোয়ে॥"[১৪]

আধুনিক বাংলা গদ্যে এর ভাষান্তর করলে দাঁড়ায়ঃ হুসেন শাহ প্রসিদ্ধ সুলতান ছিলেন। তাঁর ছত্র ও সিংহাসন সুশোভিত ছিল। তিনি পণ্ডিত, বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ছিলেন। তিনি পুরাণ পড়ে অর্থোপলব্ধি করতে পারতেন। তাঁকে ধর্মে যুধিষ্ঠির বলা শোভা পায়। তাঁর ছায়াতলে আমার আশ্রয়। তাঁর দান গণনা করা যায় না—বলি ও কর্ণকেও ছাড়িয়ে যান।······তিনি চতুর এবং জ্ঞানী, সব ভাষা জানেন, এরূপ কাউকে দেখা যায় না। সভার লোকে সকলেই তাঁর আজ্ঞাবহ, তাঁর মত আর কাউকে দেখা গেল না।

কবি কুতবন কর্তৃক উল্লিখিত হুসেন শাহকে অনেকে জৌনপুর সুলতান হুসেন শর্কী বলে মনে করেন। দিল্লীর সুলতান বহলুল লোদী ও সিকন্দর লোদীর কাছে পরাজিত হয়ে হুসেন শর্কী প্রথমে বিহার ও পরে বাংলায় পালিয়ে আসেন। গৌড় সুলতান হুসেন শাহ তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। বাংলার সীমান্তে ভাগলপুরে তিনি বসবাসের সুযোগ পান।[১৫] কুতবন পলাতক সুলতানের সঙ্গে বাংলায় এসেছিলেন কি না, এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। তবে তাঁর অন্তরঙ্গ সভাসদ ও গুণীজ্ঞাণী ব্যক্তিরা তাঁকে অনুসরণ করেছিলেন তা অনুমান করা যায়। রাজ্যের উত্থান-পতনের সঙ্গে সাংস্কৃতিক কেন্দ্রেরও পরিবর্তন আসে। মুসলমানদের হাতে কনষ্টান্টিনোপলের পতন ঘটলে বহু গ্রীক মণীষী ইউরোপের নানা স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এবং এরই ফলে

---

১৪. উদ্ধৃতি, ঐ

১৫. *History of Bengal*, Vol. II, P, 145

ইউরোপে সাংস্কৃতিক রেনেসাঁ এসেছিল। গৌড়ে পাঠান সুলতানদের পরাজয় ঘটলে এবং নগর মহামারীর কবলগ্রস্ত হলে অনেক শিক্ষিত ও পণ্ডিত ব্যক্তি আরাকান রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সপ্তদশ শতকে আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্যের বিকাশ সেজন্যেই সম্ভবপর হয়েছিল। কুতবনের পৃষ্ঠপোষক সুলতান হুসেন শর্কী রাজ্যহারা হলে জীবন নিরাপত্তা অথবা সম্প্রীতিবোধে অন্যান্য ব্যক্তির মত কবিও তাঁর অনুগামী হয়েছিলেন হয়ত।

১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে হুসেন শর্কী বাংলায় আসেন। কুতবন ১৫১২ খ্রীষ্টাব্দে 'মৃগাবতী' রচনা করেন। কবির প্রশস্তি অংশে সুলতানের যেভাবে গুণকীর্তন করা হয়েছে তাতে মনে হয় না, উক্ত চারিত্র-মাহাত্ম্য একজন হৃতগৌরব, পরাভূত এবং পলাতক রাজার প্রতি প্রযুক্ত। গৌড়াধিপতি হুসেন শাহ সম্পর্কে এর সব বিশেষণগুলি প্রযোজ্য। হুসেন শাহ যদি যথার্থই কবি কুতবনকে আশ্রয় দিয়ে থাকেন তবে বাংলায় দীর্ঘকালের (প্রায় ১৮ বছর) অবস্থানের মধ্যে সুলতানকে জানবার সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি, উপরন্তু আশ্রয়দাতার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ উক্ত প্রশস্তি-বচন কবি-কণ্ঠের স্বতনিঃসৃত বাণী বলেই মনে হয়। যিনি ধর্মে যুধিষ্ঠির, দানে কর্ণের সমকক্ষ ছিলেন, তিনি কুতবনের মত মোহাজেরকে আশ্রয় ও সাহায্য করবেন, এটা যেমন স্বাভাবিক, আবার যিনি বহু ভাষায় শিক্ষিত ও বিদ্বান ছিলেন, তিনি কুতবনের মত কবিকেও কাব্য-রচনায় অনুপ্রাণিত করবেন, এও স্বাভাবিক। হুসেন শাহের আদি জন্মভূমি আরব দেশে। অতএব 'আরবী' ভাষা তিনি জানতেন। বাংলা দেশে সুবুদ্ধি রায়ের কর্মচারী হিসেবে যখন কাজ করতেন তখন 'বাংলা'ও তাঁর ভাল আয়ত্ত হয়েছিল। রূপ, সনাতন প্রমুখ সংস্কৃত পণ্ডিত তাঁর সভাসদ ছিলেন, তিনি সে সূত্রে 'সংস্কৃত' ভাষার সহিত পরিচিত হতে পারেন। 'ফারসী' রাজভাষা ছিল। সুলতানের পক্ষে সে সম্বন্ধে

জ্ঞানলাভ অত্যাবশ্যক ছিল। 'ব্রজবুলি' ভাষারও সহিত তাঁর পরিচয় ছিল—যশোরাজ খানের রাজপ্রশস্তি থেকে অনুমিত হয়। এর পর কুতবন যদি বলেন, 'চতুর সুজান ভাষা সব জানে অইস ন দেখুঁ কোয়ে' তবে তা সত্যেরই প্রতিধ্বনি বলা যেতে পারে।

আলাউদ্দিন হুসেন শাহের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় ফারসী ভাষার দু'জন পণ্ডিতের রচনাগ্রন্থ পাওয়া যায়। তাঁরা হলেন মুহম্মদ বিন ইয়াজ্‌দান বক্স্‌ এবং মুহম্মদ বুদই-উর্ফ সৈয়দ মীর অলওয়ী। ডঃ আবদুল করিম সাহেব তাঁর Social History of the Muslims in Bengal[১৬] গ্রন্থে এ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে বলেছেন, মুহম্মদ বিন ইয়াজ্‌দান বক্স্‌ ১৫০৩ খ্রীষ্টাব্দে 'শাহীহ্‌ অল বুখারী' গ্রন্থের তিন খণ্ডে অনুবাদ সমাপ্ত করেন। গ্রন্থখানি হুসেন শাহের রাজধানী একডালায় বসে লিখিত হয়। তৃতীয় খণ্ডের পুঁথির পুষ্পিকায় সুলতান হুসেন শাহের এক দীর্ঘ প্রশস্তি আছে। 'শাহীহ্‌ অল বুখারী'তে ঐশ্লামিক ধর্মতত্ত্ব ও সমাজবিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা বিবৃত হয়েছে।

মুহম্মদ বুদই-উর্ফ সৈয়দ মীর অলওয়ী সাহেব 'হিদয়ত্‌ অল রামী' নামে একখানি ধনুর্বিদ্যা সংক্রান্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গ্রন্থখানি হুসেন শাহের নামে উৎসর্গীকৃত। সে যুগের যুদ্ধবিগ্রহে অস্ত্রশস্ত্র হিসেবে তরবারীর সঙ্গে তীরেরও ব্যবহার ছিল। কেবল যুদ্ধে নয়, শিকারাদিতেও তীর-ধনুকের উপযোগিতা প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। তীর-ধনুকের ব্যবহারে কেবল দৈহিক বল নয়, বুদ্ধি-কৌশলেরও প্রয়োজন। সুতরাং এ সম্বন্ধে গ্রন্থ প্রণয়নে যুগচাহিদা বর্তমান ছিল। সুলতান হুসেন শাহের নির্দেশে অথবা তত্ত্বাবধানে সামরিক প্রয়োজনে 'হিদয়ত অল রামী' রচিত হওয়া স্বাভাবিক। এটি ফারসী ভাষায় অনুবাদ গ্রন্থ।

---

১৬. পৃঃ ৫৫

বাংলা, সংস্কৃত, ব্রজবুলি, হিন্দী, আরবী, ফারসী প্রভৃতি ভাষায় শাস্ত্র ও সাহিত্য রচনা, শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চা সুলতান হুসেন শাহের আমলে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল—উপরের আলোচনা থেকে তা প্রমাণিত হয়। সুলতান স্বয়ং এসব ভাষায় দখল রাখতেন, তাঁর সভাসদ অনুগ্রাহক কৃপাপ্রার্থী কবি-পণ্ডিতেরা জ্ঞান, ধর্ম, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে সাধনা ও আলোচনা করে সে যুগের সাংস্কৃতিক জীবনের প্রভূত উন্নতি বিধান করেছিলেন। বিশেষতঃ বৈষ্ণবধর্ম ও বৈষ্ণব-সাহিত্যের বিকাশের এক বৈপ্লবিক প্রেরণা সূচিত হয়েছিল। ভাষার প্রয়োগ কেবল কাব্যকাহিনীর আবেগপ্রবেগের ক্ষেত্রে নয়, ব্যবহারিক-জীবনের তথ্যবিশ্লেষণে, সমাজ, ইতিহাস ও মানবচরিত্র বর্ণনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে—বিভিন্ন সমৃদ্ধ ভাষার পাশাপাশি দাঁড়িয়ে বাঙালী মনীষা যেমন বৈচিত্র্যের আস্বাদ লাভ করেছিল, বাংলা ভাষাও তেমনি নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় আগ্রহ প্রকাশের সুযোগ পেয়েছিল। সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল রচনায় এরূপ ক্ষেত্রপ্রস্তুতিতে হুসেন শাহী আমলের একটি স্বতন্ত্র মূল্য আছে।

সুলতান নাসিরউদ্দিন নসরত শাহ্

(১৫১৯—'৩১ খ্রীঃ)

বিদ্যাপতি ॥ বৈষ্ণবপদ

শেখ কবির ॥ বৈষ্ণবপদ

পিতা হুসেন শাহের যোগ্য সন্তান ও সিংহাসনের নায্য উত্তরাধিকারী হিসেবে সুলতান নসরত শাহ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি সমান আগ্রহ ও অনুগ্রহ প্রকাশ করেন। তাঁর নামোল্লেখ এবং প্রশংসা-গান করেছেন এমন তিনজন কবির পরিচয় পাওয়া যায়। এঁদের মধ্যে একজনের নাম পূর্বেই উদ্ধৃত হয়েছে—মহাভারত অনুবাদক শ্রীকর নন্দী। সুলতানের নামাঙ্কিত শ্লোকটি নিম্নরূপ ঃ

"নসরৎ সাহ তাত অতি মহারাজা।
রামবৎ নিত্য পালে সব প্রজা॥
নৃপতি হুসেন সাহ হএ ক্ষিতিপতি।
সামদান দণ্ডভেদে পালে বসুমতি॥"

'নৃপতি হুসেন শাহ' 'নসরৎ সাহ তাত' হতে পারেন না; তিনি পিতা, পিতৃব্য নন ('তাত' শব্দের অর্থ পিতৃব্য)। এজন্য পণ্ডিতগণ শ্লোকটির শুদ্ধ পাঠ দিয়ে লিখছেন—

"নসরৎ সাহ নাম অতি মহারাজা।
পুত্রসম রক্ষা করে সকল পরজা॥
নৃপতি হুসন সাহা তনয় সুমতি।
সামদান দণ্ড ভেদে পালে বসুমতি॥"[১]

এ হিসেবে নসরত শাহের আমলে সেনাপতি ছুটি খানের আদেশে শ্রীকর নন্দী উক্ত কাব্য রচনা করেন। কেবল 'ছুটিখানী মহাভারত' নয়, 'পরাগলী মহাভারতে'ও নসরত শাহের নাম পাওয়া যায়—

"শ্রীযুক্ত নায়ক সে যে নসরত খান।
রচাইল পঞ্চালী যে গুণের নিধান॥"

কেউ বলছেন, নসরতের অনুগ্রাহক রচয়িতা কবি সঞ্জয়, কেউ মনে করেন, কবি 'বিজয়পণ্ডিত' আবার কেউ মন্তব্য করেন, কবি শ্রীকর নন্দী। 'নসরত খান' ছুটিখানের অপর এবং প্রকৃত নাম।[২] আমাদের মনে হয়, 'নসরত খান' যুবরাজ নসরত শাহ।[৩] হুসেন শাহের আমলে ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যুবরাজ পদে বৃত হন এবং তখন থেকে তিনি স্বীয় নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রকাশের অধিকার পান।[৪] তাছাড়া 'যুবরাজ' অর্থে 'নায়ক' শব্দের প্রয়োগ প্রাচীন কাব্যে পাওয়া যায়। সুলতান হুসেন শাহ যুবরাজ নসরত খানের তত্ত্বাবধানে ও পরাগল

১. উদ্ধৃতি, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম—শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ১২৬

২. ঐ, পৃঃ ১২৭

৩. 'তবকাৎ-ই-নাসিরী' গ্রন্থের (মিনহাজ উস্ সিরাজ কর্তৃক রচিত) ভাষ্যকারের মতে সুলতান হুসেন শাহের জ্যেষ্ঠপুত্রের প্রকৃত নাম ছিল 'নসিব খান', 'সুলতান নাসিরউদ্দিন আবুল মুজফ্‌ফর নসরত শাহ' উপাধি গ্রহণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। (পৃঃ ৪৪৪, তবকাৎ-ই-নাসরী, ইংরেজী অনুদিত ও সম্পাদিত, ব্রজেন্দ্রনাথ দেও ও বেনীপ্রসাদ।) জৈনুদ্দিনের পৃষ্ঠপোষক যুবরাজ ইউসুফ খান যেমন সুলতান ইউসুফ শাহ, সেরূপ মহাভারত রচয়িতার অনুগ্রাহক যুবরাজ নসরত খান, সিংহাসনারূঢ় সুলতান নসরত শাহই।

৪. **History of Bengal, Vol. II, P. 152**

খানের সেনাপতিত্বে আরাকান রাজার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। চট্টগ্রাম অধিকৃত হলে পরাগল খান সেখানে প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার লাভ করেন আর যুবরাজ গৌড়ে ফিরে আসেন। চট্টগ্রামের বিজয়াভিযানের সময় অনুমিত হয় ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দ।[৫] বিজয়ের অব্যবহিত পরে কাব্যখানি কবীন্দ্র কর্তৃক রচিত হয়েছিল। কবি পরাগলের সহিত যুবরাজেরও নাম করেছেন। প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিত্বে, বীরত্বে ও দায়িত্ববোধে সুলতান হুসেন শাহ, যুবরাজ নসরত শাহ, সেনাপতি ও প্রতিনিধি পরাগল খান ও তৎপুত্র ছুটিখান স্ব স্ব ভূমিকা যোগ্যতার সহিত পালন করেছিলেন বলে এবং তাঁদের আবির্ভাবকাল প্রায় সমসায়িক ছিল বলে এরূপ নামসংযোজকের একটা 'জগাখিচুড়ি' অবস্থা লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তীকালে লিপিকারদের প্রমাদ এবং গায়েনদের প্রক্ষেপেও জটিলতা সৃষ্টির যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। এদিকে কবীন্দ্র পরমেশ্বর এবং শ্রীকর নন্দীকে অভিন্ন কবি হিসেবে মনে করার চেষ্টায় একটা সমস্যারই উদ্ভব হয়েছে। জটিলতা মোচন এবং সমস্যাভঞ্জনের প্রয়োজনীয় তথ্যোপকরণের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

পৃষ্ঠপোষক হিসেবে সুলতান নসরত শাহের নাম করেছেন আর একজন কবি—শ্রীখণ্ডের 'কবিরঞ্জন' উপাধিক বিদ্যাপতি। তিনি একটি ব্রজবুলি পদে লিখেছেন,

"বিদ্যাপতি ভাণি অশেষ অনুমানি
সুলতান নসির শাহ
মধুপ ভুলে কমলা বাণী।"[৬]

---

৫. ঐ, পৃঃ ১৫০

৬. পাঠান্তর:

"কবিরঞ্জন ভণে অশেষ অনুমানি।
রাএ নসরৎ সাহ ভুলল কমলাবানী॥"
(কীর্তন পদাবলী—সুধীন্দ্র রায় ও অপর্ণা দেবী সম্পাদিত)

ডঃ শহীদুল্লাহ অন্য একটি ভণিতার উল্লেখ করেছেন,

"নসীর সাহ ভাণে
মুঝে হানল নয়ন বাণে।
চিরঞ্জীব রহ পঞ্চ গৌড়েশ্বর
কবি বিদ্যাপতি ভানে।"[৭]

এ বিদ্যাপতি মৈথিল কবি বিদ্যাপতি নন; মৈথিল কবির উপাধি ছিল 'মহারাজ পণ্ডিত'। 'কবিরঞ্জন' উপাধিধারী বাঙালী কবিকে 'ছোট বিদ্যাপতি' নামে অভিহিত করা হয়। অনেকে 'গোপালবিজয়' কাব্যের রচয়িতা 'কবিশেখর' উপাধিধারী দৈবকীনন্দন সিংহকে ছোট বিদ্যাপতির সহিত অভিন্ন মনে করেন।[৮] আখ্যানকাব্য ও গীতিকাব্য উভয় রচনায় কবির দক্ষতা ছিল। 'দণ্ডাত্মিকা পদাবলী' নামে তাঁর একখানি গীতিকাব্য পাওয়া যায়। শ্রদ্ধেয় ডঃ শহীদুল্লাহ মনে করেন এ-'বিদ্যাপতি' নাম নয়, দৈবকীনন্দনের উপাধি।[৯] একই ব্যক্তির উপাধি বিদ্যাপতি, কবিরঞ্জন, কবিশেখর দৃষ্টে মনে হয়, কবি সমসাময়িককালে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি কার কাছ থেকে কি ভাবে খেতাব পেলেন, তা উল্লেখ করেননি।

পদকার বিদ্যাপতি সুলতান নসরত শাহের সভায় কর্মচারী ছিলেন। কবির কণ্ঠে পদটি শুনে এবং তার রসগাঢ়তা উপলব্ধি করে তবে তিনি কবিকে 'নয়ন বাণ' নিক্ষেপ করেছিলেন। 'রসকল্প-

৭. পাঠান্তর:

সে যে নসিরা সাহ জানে।
যারে হানিল নয়ন বাণে॥
চিরঞ্জীব রহ পঞ্চ গৌড়েশ্বর
কবি বিদ্যাপতি ভনে।

৮. শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়—প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম, পৃঃ ১৭২

৯. বাংলা সাহিত্যের কথা, পৃঃ ৬৮

বল্লী'তে রামগোপাল দাস লিখেছেন, যশোরাজ খান, দামোদার এবং কবিরঞ্জন 'রাজসেবী' ছিলেন। 'যশোরাজ' হুসেন শাহের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। 'কবিরঞ্জন' উপাধিক বিদ্যাপতি নসরত শাহের রাজকার্যে বহাল থেকে এবং কবিতা রচনা করে সুলতানের অনুগ্রহ পেয়েছিলেন, তা কষ্ট কল্পনা নয়। যুবরাজ নসরত শাহ যদি পরমেশ্বরকে 'কবীন্দ্র' উপাধি দিয়ে থাকেন, তবে সুলতান নসরত শাহ বিদ্যাপতিকে 'কবিরঞ্জন' উপাধি দিতে পারেন।

শেখ কবীর নামে একজন মুসলমান পদকর্তার ভণিতায় নসরত শাহের নাম পাওয়া যায়। চরণটি নিম্নরূপ—

"সেখ কবির ভণে অহিগুণ পামরে জানে।
ছুলতান নছির সাহ ভুলল কমল বনে॥"[১০]

প্রায় অনুরূপ পদের ভণিতায় শেখ কবীরের স্থলে কবি শেখরের নাম পাওয়া যায়।

"কবিশেখর ভণ অপরুব রূপ দেখি।
রাএ নসরদ সাহ ভজলি কমলমুখি॥"

---

১০. সমস্ত পদটি নারীদেহের (রাধার) অপূর্ব রূপ বর্ণনাঃ

অকি অপরূপ রূপে রমণী ধনি ধনি।
চলিতে পেখল গজরাজগমনী ধনি ধনি॥
কাজলে রঞ্জিত নয়ন ধনি ধবল ভালে।
ভোমরা ভোলল বিমল কমল দলে॥
গুমান না কর ধনি খিন অতি মাঝাখানি।
কুচগিরি ফলের ভরে ভাঙ্গিয়া পড়িব জোবনী॥
সুন্দরী চান্দমুখি বচন বোলসি হাসি।
আমিআ বরিষে জানি জৈছে শরদে পূরণ শশী॥
শেখ কবিরে ভণে ··· ··· কমল বনে॥

বিদ্যাপতির ভণিতাতেও অভিন্নপ্রায় পদ 'পদকল্পতরু' কাব্যসংকলনে পাওয়া যায়। সুতরাং উক্ত পদটির প্রকৃত রচয়িতা কে তা নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়েছে। আমরা আগে দেখেছি, 'কবিশেখর' উপাধিক দৈবকীনন্দন সিংহ এবং 'কবিরঞ্জন' উপাধিক বিদ্যাপতি অভিন্ন ব্যক্তিরূপে অনুমিত। ডঃ শহীদুল্লাহ সাহেব শেখ কবীর এবং কবি শেখরকে আবার একই ব্যক্তি বলে মনে করেন।[১১] তাঁর মতে, মুসলমান লিপিকরদের প্রমাদে এরূপ বিপর্যয়মূলক পাঠ এসে গেছে। ডঃ এনামুল হক সাহেব বিপরীত প্রশ্ন তুলে বলেছেন, পাণ্ডুলিপিকারের প্রমাদে 'শেখ কবির' 'কবি শেখরে'ও পরিণত হতে পারেন।[১২] শ্রদ্ধেয় হক সাহেবের যুক্তিটি মেনে নেওয়া যেত, যদি বিদ্যাপতির ভনিতা না পাওয়া যেত। তিনজনই যদি স্বতন্ত্র ব্যক্তি হন, তবে এর প্রকৃত রচয়িতার অনুসন্ধান করার প্রয়োজন আছে। 'গোপাল বিজয়' রচয়িতা কবি শেখরের ভণিতায় সুলতান নসরত শাহের নাম পাওয়া যায় না। বিদ্যাপতির ভণিতায় পাওয়া যায়। বিদ্যাপতি রাজসভায় উপস্থিত ছিলেন, আমরা পূর্বেই তা অনুমান করেছি। শেখ কবীরের মন্তব্য অনুসারে বলা যায়, তিনিও রাজসভায় উপস্থিত ছিলেন। এ প্রসঙ্গে জনাব হক সাহেবের উক্তিটি স্মরণীয়: "রাধিকার রূপ বর্ণনা শুনিয়া সুলতান যে প্রেমের কমল-বনে ভুলিয়া প্রবেশ করিয়াছেন অর্থাৎ প্রেমমুগ্ধ হইয়াছেন, তাহা তাঁহার একটি গুণ এবং সুলতানের এই গুণ সম্বন্ধে 'পামর' কবি অবগত আছেন। কবি রাজকর্মচারী না হইলে, সুলতানের নামোল্লেখ করিতে গিয়া নিজেকে 'পামর' বলিয়া পরিচয় দিতেন কিনা সন্দেহের কথা।"[১৩]

---

১১. বাংলা সাহিত্যের কথা, পৃঃ ৬৮

১২. মুসলিম বাংলা-সাহিত্য, পৃঃ ৭১

১৩. ঐ, পৃঃ ৭১

বৈষ্ণবভাবাপন্ন অন্যান্য (শ্রীযতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্যের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১০২ জন) মুসলমান পদ কর্তার মত 'কবীর' নামধেয় যে কবির নাম 'গৌরপদতরঙ্গিনীতে' পাওয়া যায়, তাঁর অস্তিত্ব যদি অস্বীকার না করি, তবে শেখ কবীরকেও কবিত্বের অধিকারীরূপে স্বীকার করতে হয়। হতে পারে উভয়ে অভিন্ন ব্যক্তি। শেখ কৌলিক উপাধি। শেখ কবীর এবং বিদ্যাপতি সমসাময়িক কবি ছিলেন। একই সুলতানের সাহচর্য লাভ করেছিলেন বলে পরস্পরের ভণিতার ভঙ্গি-সাদৃশ্য লক্ষ্যগোচর হয়। পদটি আদিতে, খুব সম্ভব, শেখ কবীরই রচনা করেছিলেন। তাঁর রচনায় আরবী ফারসী শব্দের একাধিক প্রয়োগ আছে—যেমন, 'গুমান' 'মাঝা' (কোমর), 'পামর' প্রভৃতি। কবি শেখর ও বিদ্যাপতি কেবল 'মাঝা' শব্দটি প্রয়োগ করেছেন। কবিতার দেহে খাঁটি মুসলমানী শব্দ এবং ভণিতার মধ্যে মুসলমান কবির নাম সব কিছুই প্রক্ষিপ্ত মনে করার পেছনে এমন কি আত্মপ্রসাদ আছে ? একজন মুসলমানের পক্ষে বৈষ্ণব পদ রচনা করা তখন মোটেই অস্বাভাবিক ছিল না। শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্মের বন্যায় শুধু শান্তিপুর ডুবুডুবু নয়, সারা বাংলাদেশেরই ভরডুবু অবস্থা। শ্রীচৈতন্য গৌড়ে উপস্থিত হলে সুলতান হুসেন শাহ তাঁকে 'গোসাঞি' বলে স্বীকার করেন এবং তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নির্দেশ দেন। যবন হরিদাস সে সময়েই বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। সুলতান নসরত শাহ ১৫৩১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এর দু'বছর পর ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে চৈতন্যদেব দেহত্যাগ করেন। তাঁর বৈষ্ণব ধর্ম পালন ও প্রচার নসরত শাহের আমলেই প্রকৃতপক্ষে এবং চূড়ান্তভাবে রূপগ্রহণ করে। নদীয়া তনয় শ্রীচৈতন্য দেশময় যখন আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন এবং রাজশক্তির বিরুদ্ধাচরণেরও যখন কোন প্রমাণ নেই, তখন

রাজকর্মচারী শেখ কবীর যদি বৈষ্ণব ভাব নিয়ে কবিতা রচনা করেন, তবে বিস্ময়ের কি আছে? উক্ত পদটির মধ্যে ভক্তিরসাপ্লুত বৈষ্ণবীয়তার সহিত তুলনায় যদি যৌবনবতী নারীর রূপবর্ণনায় বাস্তব-রসাশ্রিত মানবিকতা প্রাধান্য লাভ করে থাকে, তবে একজন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ভক্তের স্থলে একজন প্রকৃত কাব্যামোদীর (ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত বলে) মানস-প্রকল্পের সক্রিয়তা সংগত ভাবেই স্বীকার্য। সারা মধ্যযুগে হিন্দু কবিগণ কাব্যরচনাকে ধর্ম সাধনার অঙ্গ বলেই মনে করতেন; মুসলমানগণ এরূপ মনোভাব পোষণ করতেন না। তাঁরা চিত্তবিনোদন নিমিত্ত কাব্যরচনা ও কাব্যপাঠ করতেন।

সুলতান আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ

(১৫৩২—'৩৩ খ্রীঃ)

শ্রীধর ॥ বিদ্যাসুন্দর

আফজাল আলি ॥ বৈষ্ণবপদ

নসরত শাহের পুত্র ফিরোজ শাহ মাত্র কয়েক মাস রাজত্ব করেছিলেন। স্বল্পকালের মধ্যেও সুলতান বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠ-পোষকতায় স্বীয় বংশের ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। তাঁর অনুগ্রাহক দু'জন কবির নাম পাওয়া যায়—প্রথম, আখ্যানকবি দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজ এবং দ্বিতীয়, পদকর্তা আফজাল আলি।

যুবরাজ থাকাকালীন ফিরোজ শাহ শ্রীধর কবিরাজকে 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যরচনায় অনুপ্রাণিত করেন। শ্রদ্ধেয় আহমদ শরীফ সাহেব লিখেছেন "কবি শ্রীধর তাঁর পৃষ্ঠপোষকের প্রতি বিগলিত চিত্ত ছিলেন ; তাই···আট পাতার খণ্ডিত পুঁথিতেও আমরা নয়টা ভণিতা পাচ্ছি। কবি ফিরোজ শাহর সভাকবি না হলে শুধু রাজভক্তি প্রদর্শনের জন্যে কখনো সব ভণিতায় ফিরোজ শাহর নামোল্লেখ করতেন না। সম্ভবত 'কবিরাজ' ফিরোজ শাহ প্রদত্ত উপাধি।"[১]

১. শা'বারিদ খানের গ্রন্থাবলী, ভূমিকা পৃঃ (ন)

ফিরোজ শাহের গুণকীর্তন করে কবি শ্রীধর বলেছেন—

"নৃপতি নসির শাহ তনয় সুন্দর।
সর্বকলা নলিনী ভোগীত মধুকর॥
শ্রীপেরোজ সাহা বিদিত যুবরাজ।
কহিল পঞ্চালী ছন্দে ছিরি কবিরাজ॥"

অথবা

"রাজা শ্রীপেরোজ সাহা বিনোদ সুজান।
দ্বিজ ছিরিধর কবিরাজা পরমান॥"

শ্রীধরের পৃষ্ঠপোষকের পরিচয় ও নির্দিষ্টতা সম্বন্ধে আমাদের কোন দ্বিধা নেই। শিল্পসাহিত্যের চর্চায় উৎসাহ দান যুবরাজদের যেন রীতিতে দাঁড়িয়ে গেছিল। ভাবী সুলতান হিসেবে সর্ববিষয়ে যোগ্যতা অর্জনের একটা মানসিক প্রস্তুতির প্রেক্ষাপটে এরূপ কল্পনা একেবারে অভব্য নয়। বিশেষতঃ বাংলার জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করতে চলেছেন যিনি, তাঁর পক্ষে বাংলা ভাষা জানা অত্যাবশ্যক ছিল এজন্য যে, জাতীয় মনোভাব হৃদয়ঙ্গম করতে হলে লৌকিক ভাষাই প্রত্যক্ষ এবং প্রশস্ত মাধ্যম। যুবরাজ ফিরোজ শাহ শ্রীধরকে 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য রচনায় অনুপ্রাণিত করে সে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। 'বিদ্যাসুন্দর' অনুবাদ কাব্য—গীতিনাট্যের ভঙ্গিতে রচিত।

হিন্দু লৌকিক ধর্মকাবের একটি শাখা মনসামঙ্গলের দুজন কবির পরিচয় পূর্বে পেয়েছি। বিদ্যাসুন্দর কাব্যশাখারও দুজন কবিকে পেলাম। এতে প্রমাণিত হয়, স্থানীয় লোকসংস্কৃতি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। প্রথম কবি কঙ্ক বিদ্যাসুন্দর আখ্যানের ভেতর দিয়ে পীরমহাত্ম্য প্রচার করেছেন। শ্রীধর কালিকাদেবীর পূজা প্রচার করেছেন।

বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গলে 'হাসেন হোসেনের পালা'য় মুসলমান দ্বারা মনসাপূজা করার কথা বলা হয়েছে। অতি নিম্নস্তরের হিন্দু সম্প্রদায়

থেকে ধর্মান্তরিত মুসলমানদের পক্ষে পূর্ব সংস্কারবশতঃ এরূপ লোকাচার-পালন অসম্ভব ছিল না। বিজয়গুপ্ত ও কবি কঙ্কের রচনায় যথাক্রমে মুসলমান কর্তৃক মনসাপূজা এবং হিন্দু কর্তৃক পীরপূজা প্রচারের মধ্যে একটা সাংস্কৃতিক সমন্বয় গড়ে উঠছিল বলে আভাসিত হয়। কাব্যের প্রচার এবং জনপ্রিয়তার দরুন মনে হয় না—ধর্মের দোহায় এ নিয়ে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনরূপ মতবিরোধ ঘটেছিল। দ্বন্দ্ব বাধলে কাব্যের প্রচার বন্ধ হয়ে যেতো। পরবর্তী কবি বংশীদাসের মনসামঙ্গলেও (১৫৭৫ খ্রীঃ রচিত) উক্ত পালাটির পুনরাবর্তন লক্ষ্য করা যায়। সুস্থ যুগপরিবেশ এভাবে স্বাধীন চিত্তবৃত্তির বিকাশের সহায়ক হয়ে উঠেছিল। সেদিনের কাব্যে এরূপ বিষয়মুক্তি ধর্ম-সমাজ-সংস্কৃতির দিক থেকে জাতীয়জীবনের বিশেষ গুরুত্বই বহন করে। রাজছত্রতল থেকে এ আদর্শ লোকসভাতলে ছড়িয়ে পড়েছিল।

বৈষ্ণব পদকার আফজাল আলি একটি পদের ভণিতায় লিখেছেন—

"ছৈয়দ পেরোজ সাহা সুধাময় অবগাহা
ভজসখি সুরঙ্গ চরণ ॥"

কেউ হয়ত সৈয়দ ফিরোজ শাহকে কবির পীর অথবা গুরু বলে মনে করতে পারেন। কিন্তু কবির রচিত অন্য গ্রন্থ 'নসীহৎ নামায়' স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন যে, তিনি শাহ রুস্তমের শিষ্য ছিলেন। ফিরোজ শাহের আগে 'সুলতান' শব্দ ব্যবহার না করে কৌলিক উপাধি 'সৈয়দ' শব্দ প্রয়োগ করেছেন। এতে অনুমিত হয়, কবি যুবরাজ ফিরোজ শাহের সাহচর্য লাভ করেছিলেন। মাত্র তিন মাসের রাজত্বে সুলতান ফিরোজ শাহ অপেক্ষা পূর্বের 'বিদিত যুবরাজ' (শ্রীধর কথিত) সৈয়দ ফিরোজ শাহ ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী হিসেবে জনপ্রিয়তা অর্জন করে-ছিলেন, বলা যায়।

কবি আফজাল আলির অন্যান্য পদে এবং 'নসীহৎনামা' ধর্মীয় গ্রন্থে

সুলতানের নাম পাওয়া যায় না। সুলতানের নামাঙ্কিত প্রাগুক্ত শ্লোকে তাঁর চরণবন্দনার রীতিতে প্রতীয়মান হয় যে, কবি তাঁর নিকটসান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। শ্রীধরের সমসাময়িক কবি হিসেবে তিনিও স্বীয় অনুগ্রাহকের একাধিক স্থানে নাম লিখতে পারতেন। বিশেষতঃ 'নসীহৎনামায়' সে অবকাশ ছিল।

কবির পৃষ্ঠপোষক সুলতান ফিরোজ শাহের স্বপক্ষে একটি কারণ হিসেবে ডঃ এনামুল হক সাহেব বলেছেন, এক ব্যক্তির দুই পীরের কোন উদাহরণ বা রেওয়াজ নেই, অতএব তিনি পীর নন, সুলতান বা বাদশাহ।[২] কিন্তু তাঁর এ যুক্তি দুর্বল এবং তথ্যবিরোধী। 'মল্লিকার হাজার সওয়াল' কাব্যের রচয়িতা সেরবাজ (ত্রিপুরারাজ্যের কবি) ভণিতায় তিনজনের পদবন্দনা করেছেন, খুব সম্ভব তিনজনেই (সৈয়দ বাজ্গি, হাসন সরিফ ও বদিউদ্দিন) কবির গুরু বা গুরুস্থানীয় ছিলেন।[৩] অতএব 'শাহা রুস্তম' ও 'ফিরোজ শাহা' উভয়ই কবির গুরু ও গুরু-স্থানীয় ব্যক্তি হতে পারেন। তবে এটা ঋণাত্মক অনুমান মাত্র, সত্য নাও হতে পারে। এমনও হতে পারে যে, 'নসীহৎনামা' রচনার পর কবির খ্যাতি বাড়লে তবে সুলতানের নেকনজরে পড়েছিলেন এবং সভায় স্থান পেয়েছিলেন। কবির পূর্ণ প্রতিষ্ঠালাভের এবং সুলতান কর্তৃক সম্মানিত হওয়ার আগে ফিরোজ শাহ নিহত হলে আফজাল আলি রাজানুগ্রহ হতে বঞ্চিত হন এবং কাব্য রচনায় বিরত হন। সম্ভবতঃ এজন্যই তাঁর কাব্যে বা বৈষ্ণবপদে সুলতানের একাধিক নাম পাওয়া যায় না। ফিরোজ শাহ গুণের মর্যাদা দিতেন; শ্রীধর তাঁর অনুগ্রহ ও উপাধি পেয়ে থাকলে আফজাল আলিও তাঁর সাহচর্য ও উৎসাহ পেয়েছিলেন, তা খুবই স্বাভাবিক।

২. মুসলিম বাংলা-সাহিত্য, পৃঃ ৭৩

৩. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, পৃঃ ৯৩৫

সুলতান গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ শাহ

(১৫৩৩—'৩৮ খ্রীঃ)

বাংলা সাহিত্যের ও বাংলা ভাষার উন্নতিতে হুসেনশাহী বংশের সুলতান-পরম্পরায় অনুগ্রহ প্রদর্শন যেন একটা দৈব-উপযোগের মত ছিল। সর্বমোট ৪৫ বৎসরের চারজন সুলতানই কোন না কোন বিষয়ে এ ব্যাপারে ভূমিকা পালন করে গেছেন। এ বংশের শেষ সুলতান গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ শাহ প্রত্যক্ষভাবে কোন কবি সাহিত্যিককে অনুপ্রাণিত করেছিলেন, এরূপ প্রমাণ হস্তগত হয়নি। তিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা না করলেও, এর অগ্রগতিতে কোথাও বাধা দেননি। তাঁর রাজত্বকালেই শ্রীচৈতন্যের প্রথম জীবনীগ্রন্থ 'চৈতন্যভাগবত' (১৫৩৬ খ্রীঃ) বৃন্দাবন দাস কর্তৃক রচিত হয়। দু'বছর পর লোচন দাসের 'চৈতন্যমঙ্গল' কাব্যও পাওয়া যায়।

সুলতান মাহমুদ শাহের রাজত্বকাল আর একটি কারণে উল্লেখ্য যে, উক্ত সময়ে লিখিত একটি শিলালিপিতে বাংলা হরফের ব্যবহার দেখা যায়। শিলালিপিখানি বর্তমানে রাজশাহী যাদুঘরে সংরক্ষিত। এতে ১৪৫৫ শকাব্দ বা ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে একটা সেতু নির্মাণের কথা আছে। সেতু নির্মাণের তরিখাটি বাংলাগন্ধী সংস্কৃতভাষায় বাণীকৃত, কিন্তু বাংলা

হরফে লিপিবদ্ধ। শিলালিপিটির সম্পূর্ণ পাঠ নিম্নরূপ ঃ

॥ শ্রীরস্তু ॥

"শকে পঞ্চ পঞ্চা শদধিক চতুর্দশ শতঙ্কিতে মধ্যৌ
শ্রীশ্রী জন্ম মহামুদ সাহ নৃপতে সময়ে নুরবাজ
খান পুত্র মহাপাত্রাধিপাত্র শ্রীমৎ ফরাস খাঁনেন্‌ সংক্র
মোয়ং বিনির্মিত ইতি।"

তরিখাটি সংস্কৃতে বাণীকরণের অর্থ বুঝি না, কিন্তু বাংলায় লিপিকরণের তাৎপর্য অনুমান করা যায়। বাংলা ভাষায় কোন হুকুমনামা খোদাই করার রেওয়াজ হয়ত তখনও প্রচলিত হয়নি। পূর্বকাল হতে সংস্কৃতে রচিত ও খোদিত হয়ে আসছে। রাজানুগ্রহের আতিশয্যে বাংলাপ্রীতি জনসাধারণের মধ্যে জাগ্রত হলে সম্ভাব্যক্ষেত্রে এর ব্যবহার অস্বীকৃত হয়নি। এখন যেমন আন্তর্জাতিক ইংরেজী কথা বাংলা হরফে প্ল্যাকার্ড, পোস্টার ইত্যাদি লেখা হয়, তখনও হয়ত একই মানসিকতা থেকে শিষ্টভাষার বাণী লৌকিক ভাষায় লিখিত ও প্রচারিত হত।

প্রধান উজির ফরাস খানের উক্ত নির্দেশ সুলতান মাহমুদ শাহের রাজসভায় বাংলা ভাষার চর্চার সংকেত জ্ঞাপন করে। হুসেনশাহী বংশের রাজানুগ্রহিতার অবিচ্ছিন্নতার দৃষ্টান্তে এর সত্যতা সম্পর্কে আমরা সন্দেহ পোষণ করি না।

পরিশিষ্ট

সুলতান মাহমুদ শাহের পর শের খাঁর নেতৃত্বে বাংলায় শূর বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৫৩৯ সাল থেকে ১৫৬৪ সাল পর্যন্ত এ বংশের কয়েকজন সুলতান গৌড়ের তখ্‌তে বসেন। এঁরা কেউ শান্তিতে রাজত্ব করেননি, শের খাঁ ছাড়া অনেকের যোগ্যতারও অভাব ছিল। শূর বংশের সুলতানগণ বাংলা সাহিত্যের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন, এমন সূত্র আজও আবিষ্কৃত হয়নি। তথাপি বাংলা হরফে শের খাঁর নাম ও উপাধি অঙ্কিত একটি কামানের আবিষ্কার বাংলা ভাষার ব্যাপক প্রভাবের জ্বলন্ত স্বাক্ষর বহন করে। শের খাঁর মোগল বাদশাহ হুমায়ুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা ও বিজয়গৌরব লাভের পেছনে বাঙালীর সামরিক শক্তি ও বাংলার ধনশক্তি প্রধান অংশ গ্রহণ করেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর এ শক্তি সঞ্চয়ের মর্মমূলে এদেশবাসীর চিত্তজয়ের ও সমর্থন লাভের ইংগিত নিহিত আছে। কাব্য নয়, কামানে বাংলা হরফ ব্যবহারে যেমন একদিকে রাজনৈতিক চাতুর্যের পরিচয় দিয়েছেন, অপরদিকে তেমনি এ দেশের কৃষ্টির প্রতি তাঁর অকৃত্রিম দরদ প্রকাশিত হয়েছে। যুগমানসের অন্তরশায়ী গূঢ় আকাঙ্ক্ষাই যেন এতে প্রতিফলিত হয়েছে।

১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে আফগান সুলতান সুলেমান কররানী গৌড়ের শাসনক্ষমতা দখল করে নতুন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ওদিকে

দিল্লীতে মোগল শক্তি দুর্বার হয়ে উঠছে। মহামান্য আকবর বাদশাহ্ দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। মোগল শক্তির বিরোধিতা করার মনোবল পাঠান সুলতানের ছিল, কিন্তু জনবল ছিল না। তাই ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে মোগল-পাঠান সংঘর্ষে বিজয়লক্ষ্মী মোগলদের বরমাল্য পরিয়ে দেন। স্বাধীন চেতার অদম্য স্পৃহা ও বীর্যত্বের মূর্তপ্রতীক কররানী বংশের শেষ সুলতান দাউদ খানের পরাজয়বরনের সঙ্গে সঙ্গে যেন গৌড়েরও সৌভাগ্যসূর্য অস্তমিত হল। রাজনৈতিক বিপর্যয়ের সঙ্গে আবার বিধাতার লা'নতও যেন উপস্থিত হল। এক ভয়ঙ্কর মহামারীর কবলে গৌড়ের প্রায় বার লক্ষ নগরবাসী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। কেবল কয়েক সহস্র লোক স্থানান্তরে গমন করে প্রাণরক্ষা করেছিল। বাংলার রাজধানী তাণ্ডায় (গৌড় হতে ১৫ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে) স্থানান্তরিত হল। গর্বিত রাজৈশ্বর্য, বিলাসময় নাগরিক জীবনের জাঁকজমকতায় যে গৌড় শহর আনন্দমুখর ছিল, তা মুহূর্তে যেন প্রাণহীন পরিত্যক্ত প্রেতভূমিতে পরিণত হল। মোগল নবাব-সুবেদাররা কখনো তাণ্ডা, কখনো রাজমহল, আবার কখনো ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তরিত করলে রাজ্যের কেন্দ্রীয় সংহতি বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। লুপ্ত ঐশ্বর্য, হৃতগৌরবের আর্তবেদনা নিয়ে গৌড় অতীত-ঐতিহ্যের ভগ্নাবশেষে চিরতরে মুখ থুব্‌ড়ে পড়ে রইল।

হুসেন শাহী বংশের পর গৌড়ের পতন পর্যন্ত ৩৫ বছরে কোন সুলতানই বাংলার কবি-সাহিত্যিককে অনুগ্রহ দান করেছেন এমন নজির নেই, যদিও বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতি অপ্রতিহত ছিল। বৈষ্ণব-সাহিত্য, লৌকিক মঙ্গলকাব্য, গীতিকবিতা, অনুবাদ সাহিত্য, রোমান্টিক প্রণয়োপখ্যান প্রভৃতি রচনার গতি থেমে যায়নি। গৌড় সুলতানদের প্ররোচনায় সাহিত্যচর্চায় এমন এক গতিবেগ সঞ্চারিত হয়েছিল যে, সুলতানদের অন্তর্বিপ্লব এবং পতনেও এর প্রবাহে ভাটা পড়েনি। দেশের

জনসাধারণই দুর্যোগকালে দায়িত্ব পালনে এগিয়ে এসেছিল। বাংলার পাঠান সুলতানের ক্ষমতা অপহৃত এবং গৌড়নগরী ধ্বংস হলেও দীর্ঘ দেড় শত বছর ধরে সুলতানদের সহানুভূতি ও আগ্রহাতিশয্যে বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের বিভিন্ন শাখায় যে প্রাণপ্রাচুর্য সমাহৃত হয়েছিল, রাজানুগ্রহ হারিয়েও তার আয়ুষ্কাল দীর্ঘায়িত ও কলেবর প্রসারিত হয়েছে।

পরবর্তী পৌনে দু'শো বছর মোগল নবাবেরা কেউ বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন না। গৌড়ের সুলতানদের আদর্শে আঞ্চলিক ক্ষুদ্র জমিদারেরা কোন কোন কবিকে অনুগ্রহ দান করেছেন। চট্টগ্রাম (দৌলত উজির বাহরাম খান), আরাকান (দৌলত কাজী, আলাওল, মাগন ঠাকুর), মেদিনীপুর (মুকুন্দরাম), নদীয়া (ভারতচন্দ্র) প্রভৃতি কেন্দ্রিক রাজসভায় বাংলা সাহিত্যের চর্চা হয়েছে। বিপুলসংখ্যক কাব্য রচিত হয়েছে, শিল্পের মানোৎকর্ষও সাধিত হয়েছে ; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সুলতান আমলের কাব্যের রূপপ্রকৃতির অনুসরণেই এযুগের কাব্যসাধনার ফসল উঠেছে, নতুন চিন্তাধারায়, নতুন রসরুচিতে মানসচারণার বিশেষ আগ্রহ প্রকাশিত হয়নি। কেন্দ্রীয় রাজশক্তির ঔদাসীন্য এর প্রধান কারণ হলেও প্রকারান্তরে স্বাধীন সুলতানদের বাংলা-প্রীতির এক সুদূরপ্রসারী প্রভাবই যেন সংজ্ঞাপিত হয়। বাংলার কাব্যজগতে তাঁরা ভাব-বিষয়, রস-রুচিতে যেন একটা স্থায়ী এবং বলিষ্ঠ চিহ্ন এঁকে দিয়েছিলেন। এ যুগে ইংরেজ না এলে এবং তার শিক্ষাদীক্ষায় দেশবাসীর একেবারে প্রাণটিকে ধরে নাড়া না দিলে এ প্রভাব কতকাল অব্যাহত থাকত, তার হিসেব দৈবই জানে, আমরা ভবিতব্যের অনুকারমাত্র।

॥ গ্রন্থপঞ্জী ॥

১। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ—বাংলা সাহিত্যের কথা (মধ্যযুগ),
রেনেসাঁস প্রিণ্টার্স, ঢাকা, ১৩৭১।

২। ডঃ এনামুল হক—মুসলিম বাংলা সাহিত্য, (২য় সং)
পাকিস্তান পাব্লিকেশন্স্, ঢাকা, ১৯৬৫।

৩। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন—(ক) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, (অষ্টম সংস্করণ)
দাসগুপ্ত এ্যাণ্ড কোং লিঃ, কলিকাতা, ১৩৫৬।
(খ) বৃহৎ বঙ্গ (২য় খণ্ড),
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৪২।

৪। ডঃ সুকুমার সেন (ক) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস
(আদি ও মধ্যযুগ)
মডার্ণ বুক এজেন্সী, কলিকাতা, ১৯৪০।
(খ) ইসলামি বাংলা সাহিত্য
বর্ধমান সাহিত্য সভা, ১৩৫৮।

৫। ডঃ অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায়—বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (১ম খণ্ড)
মডার্ণ বুক এজেন্সী, কলিকাতা, ১৯৫৯।

৬। শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় (ক) বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর ঃ
স্বাধীন সুলতানদের আমল।
(খ) প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম,
শ্রীগুরু লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৯৫৮।

৭। আহমদ শরীফ (সম্পাদিত)—(ক) শা'বারিদ খানের গ্রন্থাবলী,
বাঙলা একাডেমী, ১৩৭৩।
(খ) রসুলবিজয়,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৪।

৮। Dr. Abdul Karim—Social History of the Muslims in Bengal, The Asiatic Society of Pakistan, Dacca, 1959.

৯। Sir Jadunth Sarker (Ed)—History of Bengal, Vol 11.
Dacca University, 1948.

১০। Dr. M. R. Tarafdar—Hussain Shahi Bengal,
Asiatic Society of Pakistan, 1965.

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৮	২৫	কথ (পা. টী.)	কথা
৫১	১৫	রাণীর	রামীর
৬০	১৮	শ্রীকৃষ্ণে বিজয়ে	শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে
৮৮	২৪	বাংলা (পা. টী.)	বাঙ্গালা
৯১	৩	খুজান	সুজান